মহা প্লাবনের কাহিনী

মোহাম্মদ জুলকার নাইন

মহা প্লাবনের কাহিনী

মহা প্লাবনের
কাহিনী

মোহাম্মদ জুলকারনাইন

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মহা প্লাবনের কাহিনী
মোহাম্মদ জুলকারনাইন

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রক ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ ঃ
Avãi †ivDd miKvi

৭ম প্রকাশ জুন, ২০০৯ ইং।

বিনিময় ঃ পঞ্চাশ টাকা।

MOHA PLABONER KAHINI: Life sketch of Hazrat Nuh (As.) Written by Mohammad Zulkarnine in Bengali and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange Tk. 50/- U.S.$ 10

ISBN 984-70240-0042-0

بسم الله الرحمن الرحيم

ব্যাপারটা আর বিতর্কের পর্যায়ে নেই। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই গিয়েছে। সিদ্ধান্ত এই যে—

আবুল আলা মওদুদী এবং তার অনুসারীরা অভিশপ্ত। এদেরকে চিনে রাখতে হবে। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান এদের চিনে রাখুন। এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। প্রতিহত করুন এদেরকে। সহী হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী এদের সঙ্গে যে আচরণ করতে হবে তা এরকম— ১. এদেরকে ইমাম বানিয়ে নামাজ পড়া যাবে না। ২. এদের মেয়ে বিয়ে করা যাবে না। ৩. এদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বিয়ে দেয়া যাবে না এবং ৪. এদের জন্য দোয়া করা যাবে না।

প্রিয় মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদের গ্রাম অথবা মহল্লার মসজিদে মওদুদী-বাদীরা আনাগোনা করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখুন। মওদুদীবাদের প্রতি আসক্ত ইমাম দেখলে এই মুহূর্তে তওবা করতে বলুন তাদেরকে। না করলে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে আল্লাহ্‌র ঘরকে পবিত্র করুন।

হজরত রসূলেপাক স. এর সম্মানিত সাহাবীবৃন্দের দোষচর্চা করার কারণে আবুল আলা মওদুদী অভিশপ্ত। তার অনুসারীরাও অভিশপ্ত। তাদের আচরণ লক্ষ্য করুন— তারা সাহাবীবৃন্দের প্রতি মিথ্যা অপবাদদানকারী মওদুদীকে নেতা হিসাবে মেনে গিয়েছে। সম্মানিত সাহাবীবৃন্দকে যাচাই বাছাই করতে চায় তারা। আর মওদুদীকে মেনে নেয় নির্বিবাদে। এরকম আচরণ মোনাফেকদের আচরণ। মোমেনদের নয়। এদের শ্লোগান— 'কোরআনের আইন-সৎ লোকের শাসন'— সম্পূর্ণই ভণ্ডামী। এদেরকে উৎখাত করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে মওদুদী ফেৎনার বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন। ওলামা ও মাশায়েখদের প্রতি আবেদন— মওদুদী ফেৎনার কুফল সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে তুলুন। মসজিদের ইমাম সাহেবদের প্রতি আবেদন— প্রতি জুমআয় সমবেত মুসল্লিদের সামনে উন্মোচন করে দিন মুনাফেক মওদুদীবাদীদের ভণ্ডামীর মুখোশ। মওদুদী ফেৎনার বিষাক্ত ছোবল থেকে হেফাজত করুন সরলপ্রাণ মুসলমান জনসাধারণকে। এটা আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব।

'মহাপ্লাবনের কাহিনী' আমাদের বাইশতম প্রকাশনা। সত্যদ্বীনের প্রচারক মহান নবী এবং রসূল হজরত নূহ আ. এর নিষ্ঠা ও মানবপ্রেম আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। দ্বীনের কাজে প্রাণপাত করবার মহান শিক্ষাকে করে সমুন্নত। আমাদের অন্তর্দেশে অনুরণিত করে তোলে সেই চিরন্তন নিষ্কলুষ জীবনবোধ, 'নিশ্চয় আমাদের সালাত, আমাদের সকল সৎকর্মসমূহ, আমাদের জীবন-মৃত্যু— সবকিছুই বিশ্বপ্রতিপালক প্রভুর জন্যই।'

আমাদের এই সাম্প্রতিকতম প্রকাশনা পাঠকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করবে আশা করি। আমাদের প্রকাশনা অভিযানের সফলতার জন্য আমরা দোয়া প্রার্থী সকলের নিকট।

প্রশংসা আল্লাহ্পাকের জন্যই। রসূল মোহাম্মদ স. এর প্রতি বর্ষিত হোক সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম। তাঁর পবিত্র পরিজন, বংশধরগণ, সম্মানিত সাহাবীবৃন্দ এবং তাদের নিষ্ঠাবান অনুকারকদের প্রতিও।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী
মুকাশিফাতে আয়নিয়া ◆মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

এক

সময়ের চাকা গড়িয়ে চলে অবিরাম গতিতে।

এরই মধ্যে গড়িয়ে গেছে বহু বছর পৃথিবীর বুকে। এখনও এখানে ভোর হয়। সূর্য আলো ছড়ায় দিনের বেলা। রাতে চাঁদের ছড়ানো জ্যোৎস্নার বন্যায় মরু পাহাড় গাছগাছালী সয়লাব হয়ে যায়।

বহুকাল আগেই হজরত আদম আ. বিদায় নিয়েছেন মাটির পৃথিবী থেকে। রেখে গিয়েছেন আল্লাহ্‌তায়ালার পথে আহবানের আলোময় ধারা। তিনি তাঁর সন্তানদের মাঝে অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন হেদায়েতের বাণী। শিখিয়ে গিয়েছেন সৎ-সুন্দর জীবনযাপন পদ্ধতি।

তিনিই পৃথিবীতে প্রথম মানুষ- প্রথম নবী। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মানুষকে হেদায়েতের পথে ডেকেছেন। তারপর এক সময় চলে গিয়েছেন অস্থায়ী আবাস পৃথিবী ছেড়ে।

পরবর্তী সময়ে হজরত আদম আ. এর পুত্র হজরত শীশ আ. নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেছেন। তিনিও তাঁর পিতার প্রদর্শিত পথে মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন আদম সন্তানদের সৎপথে ধরে রাখার জন্য। তারপর তিনিও এক সময় চলে গিয়েছেন অস্থায়ী আবাস পৃথিবী ছেড়ে।

কিছুকাল হজরত শীশ আ. এর অনুসারীরা তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে চলেছিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত বন্দেগী এবং নানা প্রকারের নেক আমল করেছিলেন।

কিন্তু এ অবস্থা বহাল থাকেনি বেশীদিন। নবীর নির্দেশ ভুলে গিয়ে ভিন্ন পথে চলতে শুরু করেছিলো তারা। মেতে উঠেছিলো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতে। শয়তানের প্ররোচনায় দলে দলে বিভ্রান্ত হতে থাকলো মানুষেরা। অবশেষে আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত বন্দেগী ভুলে গিয়ে মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়লো তারা।

এভাবে নবীর নির্দেশিত পথ ছেড়ে যোজন যোজন দূরে চলে গেলো সবাই। হজরত শীশ আ. এর অনুসারীরা আর তাঁর অনুসারী রইলো না। শয়তানের অনুসারী হয়ে গেলো।

সৎপথ প্রাপ্তির আকাশে নেমে এলো কালো মেঘ। চারদিকে ছেয়ে গেলো ঘোর অন্ধকারে।

মূর্তি উপাসক আদম সন্তানদের হৃদয়ের আকাশ থেকে মুছে গেলো হেদায়েতের সর্বশেষ আলোককণাটুকুও।

এমনি এক তমসাচ্ছন্ন সময়ে দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করলেন হজরত নূহ্ আ.। জন্ম নিলেন যেনো এক আলোমাখা শিশু। মা-বাবা, পরিবার-পরিজন সবাই আনন্দিত হন এমনি এক শিশু দেখে। তারা দেখেন কেমন যেনো অন্যরকম এই শিশু। কি যেনো আছে তাঁর মধ্যে। আলাদা ধরনের কি যেনো আছে তাঁর মধ্যে- যা আর দশটা শিশু থেকে আলাদা।

সবার আদরে আদরে বেড়ে ওঠেন সেই শিশু। চোখ মেলে তাকান তিনি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন চারপাশের অবস্থা। যেনো পরিচিত হতে চান মানুষের সাথে- প্রকৃতির সাথে। তাঁর রহস্যমাখা দুচোখে ফুটে ওঠে এক অচেনা আকুতি।

কেমন যেনো আনমনা হয়ে যান তিনি মাঝে মাঝে।

সমবয়সী অন্যান্য শিশুরা তাঁকে খেলাধূলায় আহবান করলেও তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাদের ডাকে সাড়া দেন না। শুধু চেয়ে থাকেন নীরবে। তাঁর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে শিশুর দল এক সময় তাঁকে রেখে অন্যদিকে চলে যায়।

এমনি করেই সময় কাটে তাঁর।

কখনো সবার অলক্ষ্যে একা একা হারিযে যান তিনি নিসর্গের মাঝে। বুঝতে চান আকাশের ভাষা। বৃক্ষরাজির নীরব জিকির। পাহাড়ের প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি। এরকম কিছু একটা ভাবিয়ে রাখে তাঁকে সারাক্ষণ।

এক সময় শৈশব পাড়ি দিয়ে কৈশোরে পা রাখেন শিশু নূহ্। বয়সের সাথে সাথে ভাবনা বেড়ে যায় তাঁর। কিসের ঘোরে যেনো আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন তিনি। খোলা আকাশের নিচে বিশাল প্রান্তরে বসে তন্ময় হয়ে যান হজরত নূহ্।

দীর্ঘ সময় কেটে যায় এভাবেই।

এসব দেখে আশ্চর্য হন তাঁর পরিবারের লোকজন। ভাবেন তারা- নূহ্ কেমন বালক- অন্যান্য বালকের মতো নয় কেনো সে- কি হয়েছে তাঁর! পরিবারের লোকদের মনে উদয় হয় এমনি নানা প্রশ্ন। নানা আশংকা।

সময় বয়ে যেতে থাকে।

ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকেন হজরত নূহ্ আ.

দুই

যৌবনে পা দিয়েছেন হজরত নূহ্ আ.।

বিয়ে করেছেন তিনি। সংসারী হয়েছেন।

তবুও ভাবনার রাজ্য আলোড়িত হয় তাঁর। ভাবেন তিনি, এরকম কেনো তাঁর সম্প্রদায়। এরা কার ইবাদতে লিপ্ত। আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করে না কেনো এরা। মূর্তির ইবাদত করে কি লাভ হয় এদের। কি যেনো বলতে চান তিনি তাদেরকে। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। অব্যক্ত আকুতি ঝরে পড়ে তাঁর সেই দীর্ঘশ্বাসে।

স্বভাবগত তন্ময়তা নিয়ে মাঝে মাঝে তিনি হারিয়ে যান নিসর্গের মাঝে। যেনো প্রকৃতির সাথেই তিনি কথা বলে যান নিঃশব্দে। তবুও স্বস্তি পান না পুরোপুরি। আপন সম্প্রদায়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত জীবনের ভয়াবহতা এখানেও তাঁকে অশান্ত করে রাখে।

আনমনা হয়ে যান হজরত নূহ্ আ.। কোথায় যেনো হারিয়ে যান তিনি। কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন।

এমনি করেই বয়ে যায় সময়।

এক সময় তন্ময় অবস্থা কেটে যায় তাঁর। চিন্তাযুক্ত চেহারা নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘরে ফিরেন তিনি। এখানেও সেই একই অবস্থা। শুয়ে বসে কোনোভাবেই যেনো আরাম বোধ করেন না তিনি। এখানেও সেই কওমের ভাবনা- তাদের সৎপথ প্রাপ্তির চিন্তা তাঁকে ঘিরে ধরে।

সারাক্ষণ যেনো কি একুটা প্রচণ্ড অন্তর্কষ্ট অনুভব করেন তিনি।

এদিকে কওমের অবস্থা দিনে দিনে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। শিরিক, কুফর আর নানারকম পাপাচারে তারা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে জীবন। হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি তাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহায়েতই ছেলেখেলা। শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহতায়ালার নির্দেশিত পথ থেকে প্রতিনিয়তই তারা সরে যাচ্ছে দূরে।

হজরত নূহ্ আ. দারুণভাবে মর্মাহত হন এদের এ ধরনের কার্যকলাপ দেখে। ভাবেন তিনি- পরম করুণাময় প্রতিপালকের নির্দেশিত পথ ভুলে কোথায় যাত্রা করেছে মানুষ- এভাবে শয়তানী কার্যকলাপে লিপ্ত থেকে কোথায় পৌঁছতে চায় তাঁর সম্প্রদায়?

শিহরিত হন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের কলুষিত বর্তমান আর অমাচ্ছন্ন আগামী দিনের কথা চিন্তা করে। ভীত হয়ে পড়েন তিনি তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে। ভাবেন তিনি- কি হবে তাঁর কওমের।

পরক্ষণেই যেনো তিনি প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করেন ভেতরে ভেতরে- এদের জন্য কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবেন তিনি? কেমন করে সরলপথে ফিরিয়ে আনবেন সম্প্রদায়ের লোকজনকে। ভেবে ভেবে সারা হন তিনি।

সহসাই এসে গেলো সেই শুভক্ষণ।

আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে নবীপদে বরিত হওয়ার সুসংবাদ পেলেন হজরত নূহ্ আ.। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করলেন তিনি। সেই সঙ্গে লাভ করলেন পূর্ববর্তী নবীদের উত্তরসূরী হিসেবে তাঁদের নির্দেশিত পথে পথভ্রষ্ট মানুষদের আহবানের দায়িত্ব। এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে তৎপর হয়ে উঠলেন হজরত নূহ্ আ.।

নবুয়তের শুভসংবাদ প্রাপ্তির পর দীর্ঘদিনের জমে থাকা অব্যক্ত বেদনা যেনো তাঁর বুক থেকে নেমে গেলো। ভাবেন তিনি- এখন আর বসে থাকার সময় নেই- কাজে নামতে হবে- পথভোলা সম্প্রদায়কে তাদের ভুলে যাওয়া পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ পালন করার জন্য প্রস্তুত হলেন নবী।

অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া মানুষদের আলোকিত পথের সন্ধান দিতে যুগে যুগে প্রেরিত হন নবী এবং রসূলেরা। আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তাঁদেরকে মনোনীত করেন মানুষদেরই মাঝ থেকে। যখনই কোনো সম্প্রদায় সরলপথ ছেড়ে শয়তানের পথে চলতে শুরু করে- তখনই আসেন নবী ও রসূল। তীব্র আলোকবর্তিকার মতো পৃথিবীতে হেদায়েতের আলো ছড়াতে আসেন তাঁরা।

হজরত নূহ্ আ.ও নবী। অন্যান্য নবীদের মতো তিনিও এসেছেন আলোর আহবান জানাতে।

তিনি নবীসুলভ কণ্ঠে ডাকলেন তাঁর সম্প্রদায়কে- 'হে আমার সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শনকারী। যেনো তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো- তাঁকে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও। তিনি তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করবেন।'

প্রতিধ্বনিত হলো তাঁর এই আহ্বান সার বাঁধা পাহাড়ের গায়ে- উপত্যকায়। প্রবহমান বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠল যেনো তাঁর এই মর্মস্পর্শী আহ্বানে। কিন্তু যাদের প্রতি নবীর এই আহ্বান তারা শুনতে চাইলো না তাঁর কথা। তাঁর প্রতি দারুণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো তারা। কেউবা তাঁর ডাক শুনে কানে আঙ্গুল দিলো- কেউবা আপাদমস্তক করলো বস্ত্রাবৃত- যাতে তাঁর কথা শুনতে না হয়। বিস্মিত হয়ে যান নবী তাদের এ ধরনের আচরণে।

তিন

সূর্য জ্বলছে আকাশে। তপ্ত হয়ে উঠছে পথ। পথের মৃত্তিকা তপ্ত পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন হজরত নূহ্ আ.।

পথ চলতে চলতে ভাবেন তিনি- তাঁকে যে ডাকতেই হবে সত্য বিমুখ এই সম্প্রদায়কে- যতোই প্রত্যাখ্যান করুন না তারা- সত্য পথের প্রতি আহ্বান জানানোই তো তাঁর কাজ। যে করেই হোক তাদেরকে ফিরাতেই হবে শয়তান প্রদর্শিত পঙ্কিল পথ থেকে।

অবিশ্বাসের অন্ধকারে ছেয়ে আছে কওমের অন্তর। ভুলে গেছে তারা তাদের মহান পূর্বপুরুষদের বলে যাওয়া সত্য পথের কথা। হজরত নূহ্ সেকথাইতো স্মরণ করিয়ে দিতে চান তাদেরকে।

কিন্তু সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা বুঝলো উল্টোটা। নবীকেই পথভ্রষ্ট বলে মনে করলো তারা।

তারা বলাবলি করতে লাগলো নিজেদের মধ্যে- এ আবার কেমন কথা। এ লোকতো সব নতুন নতুন কথা বলে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের কথাবার্তাতো আমরা কখনো বাপদাদার মুখে শুনিনি। কি বলে সে- কার ভয় দেখায় সে আমাদেরকে! আবার কিয়ামতে জীবিত হওয়া, অস্বীকারের শাস্তির ভয়- এসব কি। কি সব উদ্ভট কথা বলে নূহ্। আমাদের পূর্ব পুরুষরাতো আমাদেরই মতো মূর্তির ইবাদত করতো। আমরা কেনো আবার তাঁর কথায় এসব ঐতিহ্যবাহী মূর্তির পূজা অর্চনা ছেড়ে দেবো?

আবারো ডাকেন হজরত নূহ্ আ. তার সম্প্রদায়কে। কিন্তু তারা তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করলো।

এভাবেই যুগে যুগে নবী রসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পাগল সাব্যস্ত হয়েছেন। নিগৃহীত হয়েছেন পদে পদে। তবুও থেমে থাকেননি তাঁরা হেদায়েতের সুমহান বাণী প্রচার প্রসারের কাজে। প্রতিহত করেছেন গোমরাহীর বিরুদ্ধ স্রোত। গোটা কওমের বিরুদ্ধে নিয়েছেন একক অবস্থান। বাধা বিপত্তি তো আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় বান্দাদের চলার পথের পাথেয়। তাই তাঁরা ভেঙ্গে পড়েন না কখনো- ডিঙ্গিয়ে যান শত বাধা বিপত্তি অবলীলায়।

এক পর্যায়ে হজরত নূহ্ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে বললেন,-' হে আমার কওম। তোমরা আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।'

নবীর কথায় আগুনে যেনো ঘি পড়লো। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো তাঁর সম্প্রদায়।

কি আশ্চর্য! ভাবে তাঁর সম্প্রদায়- কতোবড় সাহস তাঁর। তার মতো লোক আবার ভয় দেখায় আমাদেরকে।

মন্তব্য করতে লাগলো তারা- সেতো নিজেই সাংঘাতিক ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। আবার সে আমাদেরকে উপদেশ দিতে আসে। কেনো?

একথাই তারা আবার হজরত নূহ্ আ.কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো- আমরা মনে করি যে তুমি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছো। কারণ তুমি আমাদেরকে আমাদেরই বাপদাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছো। কিয়ামতে জীবন লাভ- প্রতিদান ও শাস্তি- এ সমস্ত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

তিনিও তাদেরকে সমুচিত জবাব দিয়ে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই্ তবে আমি তোমাদের মতো পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই। বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি- মহান প্রতিপালকের নির্দেশেই বলি।'

নবী রসূলগণ কখনো নিজেদের ইচ্ছা মোতাবেক কিছুই করেন না। তাঁরা তাদের ইচ্ছামত কিছু বলেনও না। তাঁরা সবকিছু আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছামতোই সম্পন্ন করে থাকেন।

হজরত নূহ্ আ. তাদেরকে আরো বললেন, 'আমিতো কেবল মহান প্রতিপালকের পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদেরই মঙ্গল নিহিত রয়েছে। এতে না আল্লাহ্তায়ালার কোনো লাভ আছে এবং না আমার কোনো স্বার্থ আছে।

চমৎকার স্বরবিক্ষেপে কথা বলতে থাকেন তিনি। তাঁর কথায় তাঁর সম্প্রদায় রাগ ভুলে বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকে। এ অবস্থায় রীতিমতো বিব্রত বোধ করতে থাকে তারা। তবুও তারা নবীর সহজ কথা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। দীর্ঘদিনের কুফুরী আকিদা তাদেরকে এই সহজ কথা গ্রহণে বাধা দেয়। গাঢ় মিথ্যা এসে তাদের সত্য গ্রহণের পথে দেয়াল তুলে দেয়।

ভিন্ন রকম যুক্তি খুঁজতে লাগলো অবিশ্বাসীর দল। নবীর কথা খণ্ডন করার জন্য নানান কুটতর্কের অবতারণা করতে লাগলো তারা।

কিয়ামতের শাস্তির বিষয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলো। তারপর সবাই মিলে রায় ঘোষণা করলো এ ব্যাপারে- তা কি করে হয়। এতো দারুণ সন্দেহজনক বিষয়। এ বিষয়ে আমরা মোটেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না।

এ প্রসঙ্গে হজরত নূহ্ আ. বলেন, 'কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা- অজ্ঞতাপ্রসুত ধারণা। আমাকে মহান প্রতিপালকের তরফ থেকে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।'

নবী রসূলরা জন্ম থেকেই অসাধারণ জ্ঞানী হয়ে থাকেন। তারা যে মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট মানুষ। অনন্যসাধারণ মানুষ। তারা যেটা জানেন- নিশ্চিতরূপেই জানেন।। সাধারণ মানুষের মতো তাঁদের জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ নয়। তাঁদেরকে আল্লাহ্তায়ালা ওহী মারফত জ্ঞান দান করেন- যা থেকে তাঁরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেন। সন্দেহবাদের সর্বশেষ চিহ্নটুকুও অনুপস্থিত থাকে তাঁদের সত্তায়। চিন্তায়। চেতনায়। প্রকৃতপক্ষে জন্মগতভাবেই জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে থাকেন তাঁরা।

হজরত নূহ্ আ. নবীদের এই চিরাচরিত গুণের কথাটিই সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

চার

এবার হজরত নূহ্ আ. এর বিরুদ্ধে তাঁর সম্প্রদায় ভিন্ন পথ অবলম্বন করলো। এবার তারা ভিন্ন দিকে তাঁর ত্রুটি আবিষ্কার করায় লিপ্ত হয়ে পড়লো।

বলতে লাগলো তারা, এ কি করে সম্ভবপর হয়। সেতো আমাদের মতোই একজন মানুষ। তার বিশেষত্ব কোথায়- কোথায় তার অনন্যতা। সে তো আমাদের মতোই পানাহার করে- নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়। তাঁকে আমরা কীভাবে অনুকরণীয় বলে মেনে নিতে পারি। এ যে অসম্ভব।

একথা বলে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর সম্প্রদায়- আল্লাহ্‌তায়ালা যদি আমাদের কাছে কোনো পয়গাম পাঠাতে চাইতেন- তাহলে তো ফেরেশতাদেরকেই প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হতো। প্রকৃত অবস্থা এই যে- আমাদের কওমেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

অমুলক সন্দেহে ভোগতে শুরু করলো অবিশ্বাসীর দল।

হেদায়েতের কাজে নবী রসূল প্রেরিত হন বারবার। তারাতো মানুষদের মধ্যে থেকেই আসেন। তারাতো হরহামেশা মানুষই হয়ে থাকেন। এটাই আল্লাহ্‌তায়ালার বিধান। তবে তাঁরা মানুষ হলেও সদগুণাবলীসম্পন্ন মানুষ। নিষ্পাপ পবিত্রাত্মা। রসূল হিসেবে দুনিয়াতে কখনো ফেরেশতা পাঠানো হয়নি- এ সহজ সাধারণ কথাটি বোকার দল বুঝতে চাইলো না।

শয়তানের কুমন্ত্রণার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন অন্তর দিয়ে তারা কিভাবেই বা একথা বুঝবে।

হজরত নূহ্‌ আ. এর মানুষ হিসেবে বিশেষত্ব সম্বন্ধে তাঁর সম্প্রদায় যে সন্দেহ প্রকাশ করে- তা পবিত্র কোরআন মজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো- সেতো আমাদেরই মতো একজন মানুষ। সে তোমাদের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি রসূল বা প্রতিনিধি পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো একজন ফেরেশতা পাঠাতেন। এরূপ উদ্ভট কথা তো বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষেও আমরা শুনিনি। লোকটা পাগল ভিন্ন কিছু নয়। তোমরা কিছুদিন অপেক্ষা করো (এর মধ্যেই তাঁর বিলুপ্তি ঘটবে)।'

এ অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর নবী তাদেরকে বলেন, 'তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে- তোমাদের প্রতিপালক পয়গাম পাঠিয়েছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে- যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে- যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করো- যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষিত হয়।'

অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মন গললো না নবীর অনিন্দসুন্দর কথায়। ভেবেও দেখলো না তারা তাঁর কথার তাৎপর্য। সহজবোধ্য কথায় বুঝিয়ে যাচ্ছেন তিনি তাদেরকে। অথচ তারা কেবলই বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছে বার বার।

তাদের এ বিরুদ্ধাচরণ যে কোথায়- কোন অন্ধকার পাতালে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে- ভাবতে গিয়ে নবী ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কি হবে তাঁর সম্প্রদায়ের শেষ পরিণতি। কুফরীর জন্য তো আখেরাতে চরম শাস্তি রয়েছেই। আরো রয়েছে শিরিকের অবধারিত মর্মন্তুদ পরিণতিও- এ থেকে যদি তারা মহান প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে তাহলে কি হবে এদের- শিউরে ওঠেন তিনি।

পথ চলেন হজরত নূহ্ আ.। বার বার তিনি আহ্বান জানান কওমের কাছে।

বার বার উচ্চারণ করেন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু আনা রসূলুল্লাহ'- আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল।

পাঁচ

হজরত নূহ্ আ. আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত পুরুষ।

তিনি আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে সংবাদ বাহক। সংবাদ বাহকের তো সংবাদ পৌঁছানো ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই্ তাই সংবাদ পৌঁছিয়ে যান তিনি।

অনেক অপেক্ষার পর কওমের কিছু সংখ্যক গরীব লোক এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। শুনলো তারা তাঁর কথা। আগ্রহ ভরে তারা উচ্চারণ করলো সেই অমিয় বাণী- 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হজরত নূহ্ আ. আল্লাহ্র রসূল।'

নবীর আনুগত্য প্রকাশের সাথে সাথেই তাদের অন্তরে দীর্ঘদিনের জমে থাকা পাপ পঙ্কিলতার অন্ধকার বিলুপ্ত হলো। সেখানে জেগে উঠলো ইমানের জ্যোতির্ময় জোয়ার।

প্রত্যাবর্তনের পথ এমনই যে এখানে কেউ প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিগত জীবনের পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এমন কি তার বিগত জীবনের পাপসমূহ-পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। মাটির মানুষের প্রতি মহান প্রতিপালকের অনুগ্রহ কতো অপার। অসীম।

মুষ্টিমেয় নবদীক্ষিত ইমানদারেরা সত্য পথের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে যেনো অন্যরকম জীবনের আস্বাদ অনুভব করলেন। ভাবলেন তারা- কোন্ অন্ধকার বিবরের অধিবাসী ছিলেন তারা এতোদিন। এমন করে তো জীবনকে কখনো তারা অনুভব করেননি আগে।

নতুন আলোকিত জীবনে পথ চলতে শুরু করলেন নবদীক্ষিত ইমানদাররা। আগ্রহ ভরে শোনেন তারা নবীর কথা। মেনে চলেন তারা তাঁর বলে দেয়া আদেশ-নিষেধ।

হজরত নূহ্ আ. প্রবল উৎসাহে শিক্ষা দিতে থাকেন তাদেরকে। এমনি করে কাটে তাদের সময়।

কিন্তু খুব একটা বেশী পরিমাণ লোকতো এলোনা- এক সময় ভাবেন নবী। বাকি রয়েছে যারা তারাও হয়তো এসে যাবে এক সময়- আশায় বুক বাঁধেন তিনি।

পালন করে চলেন তিনি প্রত্যাদিষ্ট কাজের নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব।

সতর্ক করে দেন তাঁর সম্প্রদায়কে গভীর মমতা মাখা কণ্ঠে– 'মিথ্যা মাবুদের উপাসনা তোমরা করো না। মহান প্রতিপালকের ইবাদত করো। তাঁরই অনুগ্রহ লাভে সচেষ্ট হও। তিনি ছাড়া কেউই তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং তাঁকে ভয় করো। আর তোমরা আমার অনুসরণ করো।'

এভাবে তিনি প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন দিনের পর দিন।

দরিদ্রশ্রেণীর কিছুলোক ছাড়া আর কেউই নবীর কথায় সাড়া দেয় না। কেউ তাঁর প্রদর্শিত তওহীদের পথে পা বাড়ায় না।

কেমন যেনো হয়ে যান হজরত নুহ্ আ.। মাঝে মাঝে ভাবেন, কবে এরা ফিরে আসবে আলোকের পথে- অন্ধকারের বাসিন্দা হয়ে কতোকাল এরা পড়ে থাকবে আর।

কিন্তু তাদের মনে তখন অন্য চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা ভাবছে- যারা নূহের কথায় ইমান এনেছে তারাতো একেবারেই গরীব। ধন-সম্পদ, সহায়-সম্বল তেমন কিছুই তাদের নেই- এরাতো না বুঝে শুনেও তাঁকে অনুসরণ করতে পারে।

আরো ভাবলো তারা- আমরাতো তাদের মতো নির্বোধ নই। সহায়-সম্বলহীন নই, সামাজিক প্রতিপত্তিহীনও নই। তাহলে কেনো আমরা তাদের মতো নূহ্কে অনুসরণ করবো?

এভাবে তাদের অন্ধকার অন্তরে চলতে থাকে শয়তানী ফন্দি ফিকির। এভাবেই একদিন শয়তান গর্বভরে বলেছিলো- আমি আদমের চেয়ে উত্তম।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্পাক যাদেরকে মর্যাদা দান করেন- তাঁরাই মর্যাদাবান। নিজেদেরকে নিজেরা মর্যাদাবান মনে করার অবকাশ কোথায়? তবুও হজরত নূহ্

আ. এর কওম তাই মনে করে বসলো। নিজেদেরকে নিজেরাই মর্যাদা দিতে চাইলো।

এক পর্যায়ে হজরত নূহ্ আ.কে তারা বললো- আমরা এদের মতো নই যে তোমার আদেশানুগত হয়ে যাবো এবং তোমাকে নিজেদের অনুসরণীয় নেতা বলে মেনে নেবো।

অবাক হয়ে যান নবী তাদের এ ধরনের কথাবার্তা শুনে। বলে কি তারা এসব! ইমানের দৌলত যারা লাভ করেছে তারা কি কখনো গরীব হতে পারে। তারা তো ইমানের ধনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীদের চেয়েও ধনী।

কিন্তু একথা কি করে বুঝবে তাঁর সম্প্রদায় যে, ইমানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দৌলত। তারা যে চোখ থাকতেও অন্ধ। তাদের চর্মচক্ষু তো অন্ধ নয়- বুকের ভেতরের চোখই অন্ধ। তাই তো ইমানের তীব্র আলো তাদের সে চোখে ধরা পড়ে না। হৃদয় খুলে না চাইলে এ আলো তো দেখা যায় না। বোঝা যায় না।

তওহীদের পথে প্রত্যাবর্তনের পথ নিজেরাই আগলে রাখে হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায়। তাদের দৃষ্টি মূল বিষয় ছেড়ে শুধু অন্যদিকে চলে যায় বার বার।

ছয়

তবুও থেমে থাকেন না হজরত নূহ্ আ.। সেই একইভাবে ডেকে যান তিনি তাঁর কওমের তওহীদের পথে। প্রতিদিনই তিনি আহ্বান করেন তাদেরকে আগের দিনের মতো করে। পথ চলেন দৃঢ় পদক্ষেপে।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ঋতু-প্রকৃতি-কোনোদিকেই এখন যেনো তাঁর নজর নেই। তাঁর নজর শুধু কওমের বিভ্রান্ত মানুষদের দিকে। তাঁর চিন্তার রাজ্য যেনো সম্প্রদায়ের পথপ্রাপ্তির ভাবনা নিয়েই সারাক্ষণ দোল খায়।

হজরত নূহ্ আ. এবার তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে বুঝানোর চেষ্টা শুরু করলেন। যাকে যখন যেখানে পান তাকে সেখানেই মহান প্রতিপালকের বাণী শোনাতে লাগলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা ইমান আনো। সৎপথে ফিরে এসো। এবং আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করো।'

কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপও করে না তাঁর কথায়। নিজেদের মতো করেই চলতে লাগলো তারা।

বলে যান নবী, 'আল্লাহ্তায়ালার আযাবের ভয় করো তোমরা। যদি তোমরা ইমান আনো তাহলে তোমরা জান্নাতের নেয়ামতরাজি লাভ করবে। সেখানে তোমরা অনন্ত সুখশান্তি লাভ করবে।'

এসব কথা শুনেও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে কেউ এগিয়ে এলো না নবীর দিকে। তিনি কতোই না আগ্রহ নিয়ে ডাকছেন তাদেরকে। তবুও তাঁর সম্প্রদায় নির্বিকার হয়ে পাপাচারে মেতে রইলো।

নবী বলেই যান কেবল, 'যদি তোমরা ইমান আনো তাহলে ইমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন।

তিনি তাদেরকে আরো বললেন- 'তোমাদের চারপাশের সৃষ্টিজগতের দিকে তাকিয়েও কি তোমরা কিছু বোঝো না। আল্লাহ্তায়ালার দেয়া নিদর্শনসমূহ কি তোমাদের চোখে ধরা পড়ে না? তোমরা স্পষ্টত ভুলের উপর রয়েছো।'

কিন্তু হজরত নূহ্ আ. এর এসব কথায় কর্ণপাত করলো না তাঁর সম্প্রদায়। তাঁকে জব্দ করার জন্য তারা নতুন উপায় খুঁজতে শুরু করলো। নিজেদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ আলোচনা শুরু করলো সম্প্রদায়ের সর্দার শ্রেণীর লোকেরা। তাদের চিন্তা-ভাবনায়, কথায় শুধু একই প্রসঙ্গ, কিভাবে এই লোকটাকে কোনঠাসা করা যায়- কিভাবে তাঁকে জব্দ করা যায়।

গোপনে গোপনে শলা পরামর্শ করতে থাকে তারা। এভাবেই দিন যায় তাদের।

অবশেষে তাদের আলোচনায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলো।

এবার তারা নবীর কাছে এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলো। নবীকে বললো তারা, আগে তুমি এ সমস্ত হীন ও গরীব লোকদের তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দাও। তারপর আমরা তোমার কথায় মনোযোগী হবো।

অবাক হয়ে ভাবেন হজরত নূহ্ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের কথা শুনে- কতোই না নির্বোধ এই লোকগুলো। তিনি দৃঢ়তার সাথে তাদের এই হীন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'এটা কখনোই হতে পারে না। কেননা এরা আল্লাহ্তায়ালার খাঁটি বান্দা। তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী যদি আমি তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করি- তবে আল্লাহ্তায়ালার আযাব থেকে আমি কোথাও আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবো না। আমি আল্লাহ্তায়ালার যন্ত্রণাময় আযাবের ভয় করি।'

তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ্তায়ালার দরবারে শুধু খাঁটি নিয়তবিশিষ্ট বন্দেগীরই মূল্য আছে।'

নবীর জবাব দেয়া কথাই কালামে মজীদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, 'যারা ইমান এনেছে (তারা তোমাদের দৃষ্টিতে যতই হেয় হোক না কেনো) আমি কখনো এরূপ করতে পারি না যে তাদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেই।

তারাও (একদিন) তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু আমি দেখছি- তোমরা এমন একটি দল যে (তোমরা সত্য সম্বন্ধে) কিছুই জানো না। আর হে আমার কওম- বলো দেখি, যদি আমি এ মু'মিন লোকদের তাড়িয়ে দেই তবে- আল্লাহপাকের মোকাবেলায় কে আছে যে আমাকে সাহায্য করবে। তোমরা কি একটুও চিন্তা করো না।'

সুস্পষ্ট কথায় হজরত নূহ্ আ. তাঁর সম্প্রদায়ের হীন পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিলেন। কিছুক্ষণের জন্য যেনো থমকে গেলো তাঁর কওম তাঁর তীক্ষ্ণ জবাব পেয়ে। কিন্তু চোখে মুখে তাদের চাপা আক্রোশ ফুটে উঠলো।

বিচিত্র তাদের ধারণা— শুধু ধন-সম্পদের অধিকারী হলেই যাবতীয় মঙ্গলের অধিকারী হওয়া যায়— যাবতীয় সৌভাগ্যেরও অধিকারী হওয়া যায়। যাদের এসব নেই, না তারা কোনো মঙ্গল লাভ করতে পারে- না তারা কোনোরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। তাদের এ ধরনের ধ্যান ধারণা কেবল তাদেরকে সত্যপথ থেকে দূরেই নিয়ে চললো।

সাত

হজরত নূহ্ আ. বিরামহীনভাবে বলে যান তাঁর সম্প্রদায়কে- 'হে আমার কওম। তোমরা একথা কি ভেবে দেখেছো যে- যদি আমি আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে উজ্জ্বল প্রমাণের উপর থাকি- আর তিনি নিজের দরবার থেকে আমাকে রহমতও দান করে থাকেন- কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা- তবে আমি কি তোমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে পথ দেখাবো- অথচ তোমরা সেই হেদায়েতকে পছন্দ করো না।

ক্লান্তিহীন-শ্রান্তিহীনভাবে এসব কথা বলে যান তিনি, ‘আমি যা করছি তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো ধন সম্পদ চাই না। আমার এই খেদমতের পারিশ্রমিক যা কিছু হয় তা শুধু আল্লাহ্‌পাকের কাছেই রয়েছে।

এরপরও তাঁর সম্প্রদায় নির্বিকার যেনো। তিনি যে তাদের কাছে কোনোরূপ বিনিময় আশা করেন না একথা পরিষ্কার করে বোঝাবার পরও নির্বিকার থাকে তারা।

যুক্তি খোঁজে কাফের-মুশরেকের দল। তারা ভাবে, ফেরেশতা তো সে নয়ই, তবু নিজেকে সে নবী বলে দাবী করে। কিন্তু সে কি গায়েবের খবর সম্পর্কে কিছু জানে? তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, নবী হলেই তাকে গায়েবের খবর জানতে হবে– অন্যথায় সে নবী হওয়ার যোগ্য হতে পারে না। এ যে অসম্ভব– ভাবে তারা হজরত নূহ্ আ. সম্পর্কে।

তিনি এ বিষয়ে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করলেন। তিনি তাদের খোঁড়া যুক্তি খণ্ডন করে বললেন, ‘আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ থেকে হেদায়েতের পয়গাম নিয়ে এসেছি। আমি গায়েবের খবর অবগত আছি বলেও দাবী করিনা– এমনকি ফেরেশতা হওয়ারও দাবী করি না। আমি আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত পয়গম্বর ও রসূল। আর দ্বীনের দাওয়াত প্রদান এবং পথ প্রদর্শন করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। ধন সম্পদে উন্নত হওয়া– গায়েবী বিষয়ে অবগত হওয়া তো ভিন্ন ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের ভাষ্য, ‘আর দেখো আমি তোমাদের এটা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌পাকের ধনভাণ্ডার সমূহ রয়েছে– এও বলি না যে, আমি গায়েবের বিষয়সমূহ অবগত আছি– এও আমার দাবী নয় যে, আমি ফেরেশতা। আমি এটাও বলি না যে, যাদের তোমরা হেয় প্রতিপন্ন করছো আল্লাহ্‌তায়ালা তাদেরকে কল্যাণ দান করবেন না (যেমন তোমাদের বিশ্বাস)।’

কিন্তু তবুও তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। তারা বলে বেড়াতে লাগলো– নূহ্ যা বলে তা সত্য নয়। এসব কথা মিথ্যা। হঠকারী সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো।

আজ তারা হজরত নূহ্ আ.কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলো। এটা তো নবীদের জন্য নতুন কিছু নয়। যুগে যুগে সত্যপথের পথিক নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নির্ভুল গন্তব্যে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু তারা তো নির্বিঘ্নে একাজ সমাধা করতে পারেননি। সত্য প্রচার করতে গিয়ে তাঁদেরকে নানান অপবাদে জর্জরিত হতে হয়েছে। তারপরও তারা থেমে থাকেননি- সরে দাঁড়াননি তাঁদের সেই আদিষ্ট কাজ থেকে। মিথ্যাচারের দেয়াল ভেঙে তারা এগিয়ে গেছেন দুর্বার গতিতে।

হজরত নূহ্ আ.ও তেমনি এগিয়ে চলেন নবুওয়াতের আপোষহীন পথ ধরে।

তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, 'নূহ্ পয়গম্বরের কওম (নূহের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে শুধু নূহ্কে মিথ্যুক বলেনি) সমস্ত রসূলগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

আনমনা হয়ে যান হজরত নূহ আ. পথ চলতে চলতে। ভাবেন আর কীভাবে ডাকা যায় এদেরকে। আর কীভাবে বললে, বুঝবে তারা তাঁর কথা। উৎকণ্ঠা বেড়ে যায় তাঁর।

আট

গভীর রাত।

সমস্ত মানুষ সুখ নিদ্রায় অচেতন। সুপ্তির সমুদ্রে ডুবে আছে চরাচর। নীরব নিস্তব্ধ চারদিক।

হজরত নূহ্ আ. আল্লাহ্তায়ালার দরবারে অবনত হয়ে দোয়া করতে লাগলেন তাঁর কওমের হেদায়েতের জন্য। নবী কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে যান তাঁর কওমের কল্যাণ চিন্তায়। মহান প্রতিপালকের দরবারে তাদের জন্য ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একসময় রাত পেরিয়ে যায়। কখন যেনো ভোর হয়ে যায়। ঠাহর করতে পরেন না তিনি। পূর্ব আকাশ জুড়ে ফুটে ওঠে সুবহে সাদিকের শ্বেতাভ মুখাবয়ব।

রক্তিম সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ে দিকচক্রবালে। ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে থাকে। হজরত নূহ্ আ. নতুন করে প্রস্তুতি নেন। ঘরে বাইরে পা বাড়ান তিনি।

এগিয়ে যান তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের দিকে তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালার হক দ্বীনের দিকে ডাকার উদ্দেশ্যে। পৌঁছে দেন তৌহিদের প্রেমময় বাণী। আল্লাহ্তায়ালার পাঠানো পয়গাম।

মরু প্রান্তর-উচু নীচু পথঘাট, কতোপথই না পাড়ি দিয়েছেন তিনি এরই মধ্যে তাঁর কওমকে সৎপথে ডাকার জন্য। তবুও তারা বোঝে না সেকথা। দেখে না তাঁর কষ্ট। শোনে না তাঁর কথা। কেবলই মূর্তির উপাসনায় আর নানারকম পাপাচারে লিপ্ত থাকে তারা। টেনে চলে পূর্বপুরুষদের বিভ্রান্তির জের।

দিনে দিনে কেমন যেনো বেশী রকমের অসংযত হয়ে উঠতে থাকে লোকদের আচরণ। হজরত নূহ্ আ. এর কথাবার্তা শুনে ভয়ানক খেপে গেলো তারা। যা ইচ্ছে তাই আচরণ করতে লাগলো সকলে। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে তারা যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করতে লাগলো।

তাদের এই অসুন্দর আচরণে যারপরনাই ব্যথিত হন নবী। কিন্তু তাঁকে তো সংযত থাকতেই হবে। তাঁকে তো ধৈর্যধারণ করতেই হবে। তিনি যে নবী। তিনি তো প্রেরিত হয়েছেন এই অংশীবাদী ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্যই। ভাবেন তিনি- আরো সংযম আরো ধৈর্য নিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে দ্বীনের কথা।

তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে বললেন, 'তোমরা কি সংযত হবে না। আমি তোমাদের কল্যাণার্থে বিশ্বস্ত রসূলরূপে এসেছি। অতএব তোমরা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ভয়-ভক্তি প্রদর্শন করো এবং সংযত হও। আমার কথা মেনে চলো। আমি কখনোই তোমাদের কাছে প্রতিদানপ্রার্থী হবো না। সারা জাহানের পরওয়ারদিগার যিনি, একমাত্র তাঁরই কাছে আমার কাজের প্রতিফল নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি ভয়-ভক্তি ও সংযম অবলম্বন করো এবং আমার কথা মেনে চলো।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায় আগের মতোই কুফরির উপরে স্থির হয়ে রইলো। বরং দিনে দিনে নবীর প্রতি তাদের ক্ষোভ বেড়ে যেতে থাকে। সব সময় তারা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অপদস্থ করার পাঁয়তারা করতে থাকে। আরো নানা রকম ফন্দি ফিকির করতে থাকে কাফেরদের দল। কিন্তু তবুও তারা কিছুতেই পেরে ওঠে না নবীর সঙ্গে। যখনই কোনো প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয় তারা— নবী সন্তোষজনক জবাবই তাদেরকে দিয়ে দেন।

অবিশ্বাসী জনতা নিষ্ফল আক্রোশে ফেটে পড়তে চায় যেনো।

নয়

কিছুতেই সংযত হয় না হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায়।
দিনে দিনে তাদের হঠকারিতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

হঠকারী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ এক পর্যায়ে বাড়াবাড়ির দিকে মোড় নিলো।

তাদের নিরেট অন্তর দোল খায়না নবীর মর্মস্পর্শী ডাকে। তাঁর বলে যাওয়া সহজ কথা তারা সহজ ভাবে বুঝতে চায় না। সত্য আহবান থেকে তারা কেবলই মুখ ফিরিয়ে নেয় বার বার।

সামাজিক মান মর্যাদা-প্রতিপত্তি, এসবই আজ তাদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে— যার কোনো মূল্যই মহান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে নেই। পূর্বপুরুষদের গোমরাহীই এখন তাদের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কি এক ভয়ানক ভ্রান্তিতে পড়ে আছে তারা— শংকিত চিত্তে ভাবেন হজরত নূহ্ আ.। অথচ তারা নিজেরাই সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর।

চারদিকে শুধু গোমরাহী আর গোমরাহী। শয়তানের প্ররোচনায় পূর্বপুরুষদের মতো পথভ্রান্ত হয়ে এরাও মূর্তিদেরকেই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা বলে মেনে নিয়েছে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তারা অতিমাত্রায় মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। মূর্তিপ্রেম মিশে গিয়েছে তাদের মনে মননে রক্তকণিকায়। অস্থিমজায়। কখনো তাদের মনে হয় না যে, এগুলো নিস্প্রাণ মাটির পুতুল। ভালো অথবা মন্দ– কোনো কিছু করার কোনো ক্ষমতাই এগুলোর নেই।

এক সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনায় আবারো মশগুল হয়ে যায় হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায়। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো— কি করে সত্য পথে আহবানের কাজ থেকে নূহকে ফিরোনো যায়। ভাবে তারা, একটা সাধারণ মানুষের কাছে এভাবে আর কতোকাল আমরা বিব্রত হতে থাকবো। এর একটা বিহিত করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে তা করা যায়। ভেবে হয়রান হয় তারা। এ পর্যন্ত তো কোনোভাবেই ঠেকানো গেলো না নূহকে। ইতোমধ্যেই সে আমাদের কিছু লোককে তাঁর দলে টেনে নিয়েছে। যদিও তারা গরীব শ্রেণীর, তবুওতো সে তাঁর কাজে কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। কিন্তু আমরা? আমরাতো তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারলাম না। কোনোভাবেইতো আমরা ঠেকাতে পারছি না তাঁকে। আমরা এতো বড়ো একটা কওম। তবুও একটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছি না কেনো! এ যে বড়ো লজ্জার কথা! সাংঘাতিক পরিতাপের বিষয়। এভাবে আর কতোদিন নূহের উৎপাত আমাদেরকে সহ্য করতে হবে। নাহ্ । এ অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না।

হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায় ভেবে ভেবে কোনো কুল কিনারা পায়না— কি করে তাঁর আহ্বান প্রতিহত করা যায়। তাদের মধ্য থেকে নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করে। কিন্তু তাতে করে কোনো সুরাহা হয় না সম্প্রদায়ের ভাবনা-চিন্তার।

বয়ে চলে সময়ের স্রোতরাশি।

মূর্তির উপসনায় আগের চেয়েও বেশী করে ব্যস্ত হয়ে যায় হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায়। কিন্তু তা দেখে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবার পাত্র তো নবী নন। তিনি তাদেরকে মূর্তির উপাসনা থেকে বিরত থাকার জন্য ডাক দিয়ে বললেন, 'মিথ্যা মাবুদের উপাসনা ত্যাগ করো তোমরা। আল্লাহ্তায়ালার ইবাদত করো। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত সত্য নবী ও রসূল।'

নবীর আহবান শুনে সম্প্রদায়ের নেতা গোছের লোকেরা দারুণ বিরক্ত হয়ে গেলো তাঁর উপর। তারা বললো, কি সব আবোল তাবোল কথা বলে এই লোকটা। আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া আদর্শ— মূর্তির ইবাদত আমরা কোনোভাবেই ত্যাগ করতে পারবো না। নূহ কেনো একথা বুঝতে চায় না। সে তো শুরু থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষদের আদর্শ থেকে সরে গেছে। তা যাক সে— তাতে তো আমাদের কোন আপত্তির কিছু ছিলো না। কিন্তু আমাদেরকে কেনো সে বিভ্রান্ত করতে চায়— কেনো সে আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের আদর্শ ত্যাগ করতে বলে?

বিরক্ত হয়ে একথা বললো বটে তারা। কিন্তু তাদের মনে এ আশংকা দেখা দিলো প্রবলভাবে— যদি হজরত নূহ্ এর আহ্বানে সম্প্রদায়ের আরো কিছুলোক দলছুট হয়ে যায় তাহলে তো তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। শেষে মূর্তি উপাসনার আধিপত্য কওমের মাঝ থেকে হয়তো উঠেই যাবে এক সময়। এ নিয়ে ভাবনা চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো তারা। ভাবতে লাগলো, কীভাবে কওমের লোকদের নূহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়।

আলোচনা করে এক সময় ঐকমত্যে পৌঁছলো তারা যে, কওমের সাধারণ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের মূর্তিপূজার ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে— তাহলেই কেবল নিজেদের বিচ্ছিন্নতা রোধ করা যেতে পারে।

সে মতে কাজ শুরু করে দিলো তারা। কওমের সাধারণ শ্রেণীর লোকদেরকে তারা বোঝাতে লাগলো— তোমরা কখনো নিজেদের মাবুদদের ত্যাগ করো না। আমাদের এতোদিনের গড়ে উঠা সম্মান আমরা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হতে দেবো না। যে করেই হোক আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য আমাদেরকে অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে।

দশ

গোমরাহীর ভিত দৃঢ়তর করবার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায়।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন বলে, 'আর তারা (সাধারণ লোকদের) বললো- কখনো নিজেদের মাবুদসমূহকে পরিত্যাগ করো না। আর ওয়াদ-স্বওয়া-ইয়াগুস-ইয়াউক এবং নাস্‌রকে ছেড়ো না।'

এখানে উল্লেখিত পাঁচটি নাম পাঁচটি সুবিখ্যাত মূর্তির— যেগুলো মূর্তি উপাসনার জগতে প্রবল প্রতাপে সমাসীন রয়েছে। মুশরেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা যুগ যুগ ধরে উপাস্য মূর্তি হিসেবে পরিচিত। তাদের পূর্বপুরুষরা যেমন ভক্তিভরে এগুলোর উপাসনা করেছে, তেমনিভাবে হজরত নূহ্ আ. এর সমসাময়িক কালেও তাঁর সম্প্রদায় উত্তরসূরী হিসেবে পরম ভক্তি সহকারে সেগুলোর উপাসনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই মূর্তিসমূহের কথা উল্লেখ করে কওমের সর্দারেরা সাধারণ লোকদের বুঝিয়ে তাদের দলে ধরে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো।

ভ্রষ্টতার এ বীজ শয়তান বপন করেছে বহুকাল আগেই। হজরত নূহ্ আ. এর সময়ে এসে তা পরিণত হয়েছে বিরাট বিষবৃক্ষে।

উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তি সম্পর্কে ইমাম বাগবী বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিলো হজরত আদম আ. ও হজরত নূহ্ আ. এর আমলের মাঝামাঝি সময়। তাদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিলো। তাদের ওফাতের পর তাদের অনুসারীরা দীর্ঘদিন তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদত ও বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে।

কিন্তু এ অবস্থা শয়তানের কাছে রীতিমত অসহ্য হয়ে উঠলো। মানুষ একাগ্রতার সাথে আল্লাহতায়ালার ইবাদত বন্দেগী করবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ নিষেধের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না শয়তান।

পথ খুঁজতে থাকে সে আদম সন্তানদের বিভ্রান্ত করার জন্যে। উপায় খোঁজে সে তাদের ইমানের দৌলত কেড়ে নেয়ার জন্যে। শয়তানের বুদ্ধিতে তখন নানান কুটকৌশল উদিত হতে থাকে। ভাবে সে, কীভাবে এদের জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত করা যায়।

হঠাৎ করেই একটা উপায় সে উদ্ভাবন করে বসলো। সে অনুযায়ী সে মানুষের আকৃতিতে লোকদের কাছে যেয়ে উপস্থিত হলো।

ইমানদাররা চিনতে পারলেন না বন্ধুরূপী শয়তানকে। তারা তাকে বন্ধুরূপেই গ্রহণ করলেন। শয়তান তখন তাদেরকে নানা রকম কায়দা করে বোঝাতে লাগলো— তোমরা যে সমস্ত মহাপুরুষদের অনুসরণ করো, যদি তাদের একেক জনের মূর্তি তৈরি করে সামনে রেখে নাও, তবে তোমাদের ইবাদত পূর্ণতা লাভ করবে। তোমরা আরো বিনয় ও একাগ্রতা লাভ করবে। শয়তানের প্রস্তাবে ইমানদাররা কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন। তারা ভাবলেন, তা কী করে হয়। আমরা তো কখনো এরকম কথা শুনিনি যে, তাদের মূর্তি তৈরী করলে আমাদের ইবাদত পূর্ণতা লাভ করবে। এটা আবার কী রকম কথা— মূর্তি সামনে রেখে আমাদেরকে বিনয় ও একাগ্রতা অর্জন করতে হবে।

শয়তান শংকিত হয় তাদের কথা শুনে। বিব্রতবোধ করতে থাকে সে। নিজের সাফল্য নিয়ে হয়ে ওঠে সন্দিহান। তবুও হাল ছেড়ে দেবার পাত্র তো সে নয়। সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে— কিছু সংখ্যক লোকছাড়া সে অনেক আদম সন্তানদের বিভ্রান্ত করবেই।

আবারো এগিয়ে যায় সে পরম বন্ধু সেজে নেককার লোকদের মাঝে। এবারো তার মুখে একই বুলি— তোমরা মূর্তি তৈরী করো, এতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

শয়তানের পরামর্শ শুনে এবার দ্বিধাগ্রস্ত হন কিছুসংখ্যক লোক। তারা ভাবেন, এ লোকের কথা মতো কাজ করে দেখাই যাকনা কী ফল হয়। তাছাড়া দেখাই যাকনা আসলে এটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক কিনা। তবু অধিকাংশ লোক একথা মেনে নিলো না সহজে।

তাদের কাছে শয়তান বারবার হানা দিতে থাকে তার অসৎ পরিকল্পনা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সফল হলো শয়তান। তাদেরকে সে বোঝাতে সক্ষম হলো যে, এটাই প্রকৃত পথ।

শুরু হয়ে গেলো অংশীবাদী তৎপরতা। অপরিণামদর্শী মানুষ শয়তানের কুটিল চক্রান্তে পা দিয়ে তওহীদের পথ থেকে দূরে সরে গেলো অবলীলায়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সর্বস্ব খোয়ালো তারা। অথচ তারা বুঝতেও পারলো না তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ— ইমান হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যে।

মহান প্রতিপালকের পাঠানো আদেশ-নিষেধ ভুলে তারা ডুবে গেলো কুফরি আর শিরিকের ঘোর অমানিশায়। ভয়ংকর আযাবের পথে পা বাড়ালো তারা।

প্রকাশ্য শত্রু শয়তান আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো জনপদের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবৃত্তির অনুকূল লোভনীয় পশরা সাজিয়ে।

শত্রু বেশে শয়তান উপস্থিত হলে তো তাকে চিহ্নিত করা সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু সে তো বন্ধু বেশে উপস্থিত হয়— ভালো ভালো কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর মানুষও তাকে পরমবন্ধু ভেবে ভুল করে বসে। পরিণামে আত্মঘাতি পথে পা বাড়ায়।

এতদিনে মূর্তি উপাসনার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। আর ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তারা রেখে গেছে অন্ধকারময় জীবনের কলুষিত ঐতিহ্য।

নতুন বংশধরদের কাছে শয়তান নতুন রূপে উপস্থিত হয়ে তাদেরকেও বিভ্রান্ত করার উদ্যোগ নিলো। তাদেরকে বোঝাতে লাগলো যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষদের খোদা ছিলো এই মূর্তিগুলোই।

অতি সহজে নতুন প্রজন্মও মেনে নিলো শয়তানের কথা। সত্যাসত্য যাচাই করার কোনো প্রয়োজনই তারা অনুভব করলো না। শয়তানের পরামর্শকেই তারা সত্য বলে ধরে নিলো।

শুরু করে দিলো তারা মহাসমারোহে মূর্তির উপাসনা। দিনে দিনে গাঢ় হতে লাগলো তাদের এ সমস্ত মিথ্যা মাবুদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা। এভাবে আকণ্ঠ ডুবে গেলো শয়তান নির্দেশিত সংস্কারে।

হজরত নূহ্ আ. এর জামানায় এসে তাদের এই ভক্তি উপাসনা চরমাকার ধারণ করলো। তাদের সমস্ত চিন্তাচেতনা শিরিক আর কুফুরীর পথেই আবর্তিত হতে লাগলো। তাদের মনে প্রাণে উল্লেখিত পাঁচ মূর্তির মাহাত্ম্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো।

এমনি এক সময় হজরত নূহ্ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে সরলপথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর এই আহবান তারা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না কিছুতেই।

দিনে দিনে নবীর সত্য প্রচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলো তাঁর সম্প্রদায়। আবারো পরিকল্পনায় নেমে পড়লো তারা নবীকে তাঁর প্রচার কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। কওমের সমাজপতিরা তাঁর ওপর রেগে আগুন হয়ে ওঠে। যে করেই হোক প্রতিহত করতেই হবে নূহকে। তা নাহলে আমাদের এতোদিনকার গড়ে ওঠা উপাসনাপদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে। এ যে অসম্ভব— ভাবে তারা, কোনোমতেই তা হতে দেয়া যায় না। তারা বলতে লাগলো, নূহ্কে ঠেকাও তোমরা। যে করেই হোক তাঁকে প্রতিহত করো।

এগার

হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায় তাঁকে দৈহিকভাবে আক্রমণের পাঁয়তারা শুরু করলো। তাদের দুরভিসন্ধি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। অবশেষে তারা বেছে নিলো নির্যাতনের পথ।

একদিন।

প্রতিদিনকার মতো নবী বেরিয়েছেন তাঁর প্রত্যাদিষ্ট কাজে। পথ চলতে চলতে ভাবছেন তিনি গভীর উৎকন্ঠা নিয়ে— কীভাবে আরো সুন্দরভাবে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্যের দিকে আহবান জানানো যায়। কেমন যেনো আনমনা হয়ে পথ চলেন হজরত নূহ্ আ.।

এমনি একসময় সম্প্রদায়ের কিছু দুষ্টপ্রকৃতির লোক সর্দারদের নির্দেশে তাঁর ওপর চড়াও হলো। নির্বিচারে তারা নবীকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করতে লাগলো। যে যেভাবে পারলো আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে লাগলো তাঁকে। গলা টিপে ধরে তাঁর শ্বাস রোধ করতে চাইলো কেউ কেউ।

কাফেরদের এলোপাথাড়ি মারপিটের ফলে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে গেলেন হজরত নূহ্ আ.। তা দেখে পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়লো তাঁর সম্প্রদায়। নির্বিবাদে মার খেতে থাকেন নবী। আঘাতের প্রচণ্ড বেদনায় যেনো তাঁর সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে যেতে চায়।

অনেকক্ষণ ধরে চলে তাদের এই নির্মম নির্যাতন।

প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়েন হজরত নূহ্ আ.। এক সময় বেহুঁশ হয়ে তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটির উপর। দুর্বৃত্তের দল তাঁকে ফেলে রেখে চলে যায়।

সমস্ত দেহ জুড়ে দুর্বৃত্তদের প্রচণ্ড আঘাতের চিহ্ন। সংজ্ঞাহীন নবী পড়ে থাকেন উন্মুক্ত আকাশের নিচে।

অনেকক্ষণ এভাবে থাকার পর ধীরে ধীরে তাঁর বেহুঁশ অবস্থা কেটে যায়। বিস্ময় যেনো তাঁর কাটতে চায় না কিছুতেই। এ কেমন কওম? মানবতার সবচেয়ে

আপনজন নবীকে চিনতে পারলো না তারা। তাঁর কওমের চিন্তায় শংকাতুর হয়ে ওঠেন তিনি। ভাবেন তিনি— ওরা কি করলো আজ। অবুঝের দল নির্মম নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত করলো কাকে, একটুও ভাবলো না তারা। অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় নূহ্ নবীর দু'চোখ।

পরক্ষণেই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হাত তুললেন তিনি মহান রব্বুল ইজ্জতের দরবারে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার কওমকে ক্ষমা করুন। ওরা অবুঝ।'

কি অভূতপূর্ব মহানুভবতা। এ রকম ঔদার্য যে কেবল নবী রসূলদের পক্ষেই শোভা পায়। বিভিন্ন সময়ে নবী রসূলগণ বিপথগামী লোকদেরকে সত্য পথে আহ্বান জানাতে গিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। তবুও তাঁরা কখনো ভেঙ্গে পড়েন না— পিছপা হন না। নির্যাতন-নিপীড়নেও কওমের মঙ্গল কামনায় তাঁরা থাকেন অটল। পর্বতের মতো। সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়েও তাঁরা জ্বালিয়ে রাখেন আশার জ্যোতির্ময় প্রদীপ। আকাশছোঁয়া বাৎসল্য নিয়ে তাঁরা মহান প্রতিপালকের দরবারে মোনাজাত করেন আপন সম্প্রদায়ের হেদায়েতের আশায়।

বারো

আহ্বান চলে দীর্ঘদিন ধরে।

বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়।

কিন্তু কিছুতেই তাঁর সম্প্রদায় ফিরতে চায় না তাঁর নির্দেশিত পথে। একে একে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় অত্যাচারী দল। তাদের মৃত্যুর পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় নতুন বংশধরেরা। হজরত নূহ্ আ. ভাবেন, এরাতো নতুন। এরা বুঝি এবার ইমান আনবে— এরা বুঝি তাঁর সত্য আহ্বানে সাড়া দিবে।

নতুন উদ্দীপনায় কলেমার দাওয়াত নিয়ে তিনি এগিয়ে যান নতুন বংশধরদের কাছে। মশগুল হয়ে যান তাদের নিয়ে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তাঁর আহ্বান। তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় সেই একই বাণী— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আনা রসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল)।

তাঁর আহ্বানের বাণী প্রতিধ্বনিত হয় সারবাঁধা পাহাড়ের গায়ে, উপত্যকায়— বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। বলে যেতে থাকেন হজরত নূহ্ আ. অবিরাম। তাঁর উচ্চারিত তওহীদের বাণী তাঁর সম্প্রদায়ের নতুন বংশধরদের কানে পৌঁছায় এক সময়।

ভাবে তারা, কি বলে এই লোকটা। সে আবার আল্লাহ্র রসূল হয় কীভাবে। আর মাবুদ তো আমাদের আছেই। নতুন কোনো মাবুদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। কি বলে সে এসব? যতোসব আজগুবী কথাবার্তা। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের কথাই মান্য করবো। তাদের কথা মতোই আমরা চলবো। অন্য কোনো কথা আমরা শুনতে চাই না। মানতে চাই না।

আবারো বললেন, হজরত নূহ্ আ. তাদেরকে সেকথা, যে কথা তিনি তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে বলেছেন, 'হে আমার সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী। যেনো তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো— তাঁকে ভয় করো এবং আমার অনুগত হও। তিনি তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করবেন।'

তিনি আরো বলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়। আমার মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের মতো পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই। বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের তরফ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি— মহান প্রতিপালকের নির্দেশেই বলি।'

কিন্তু সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মও তাদের পূর্বপুরুষদের মতো সেই একই কায়দায় নবীর প্রচারিত বাণী উপেক্ষা করতে লাগলো। কি যেনো একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে আছে তাঁর সম্প্রদায়ের নতুন বংশধর।

প্রবল উপেক্ষা সত্ত্বেও হজরত নূহ্ তাঁর আহ্বানের কাজ চালিয়ে যান। আবারো বলেন তিনি, 'হে আমার কওম। তোমরা মূর্তির উপাসনা ছেড়ে আল্লাহ্র ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।'

হজরত নূহ্ আ. এর প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মের লোকদের উপেক্ষা অব্যাহত রইলো। কেউ তারা এগিয়ে আসেনা নবীর কথা শুনবার জন্য। বুঝবার জন্য। দিনে দিনে কেবলই তারা মূর্তির উপাসনায় গা ভাসিয়ে দিতে থাকে। আর অন্যান্য পাপাচার তো তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে আছেই।

দুঃখ পান নবী তাদের এ ধরনের হঠকারিতায়। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে সম্পাদন করে চলেন আপন দায়িত্ব। ফিরে যান তিনি আবার তাঁর সেই কওমকে হেদায়েতের প্রচেষ্টায়।

সময় বয়ে যায়।

একে একে নতুন প্রজন্মের লোকেরাও বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে। তাদের স্থানে আসে তাদের পরবর্তী বংশধরগণ। তারাও তাদের পূর্বপুরুষদের মতো শিরিক-কুফুরীর অনুসরণ করতে লাগলো।

হজরত নূহ্ আ. তাদের নিয়ে নতুন করে যেনো আশান্বিত হলেন। ভাবেন তিনি, তাদের তৃতীয় পুরুষতো আগের লোকদের মতো নাও হতে পারে। এরা হয়তো এই হেদায়েতের ডাকে সাড়া দেবে। এরা হয়তো আমার কথা শুনবে।

কওমের তৃতীয় পুরুষকে সরল পথের দিকে আহ্বান জানান নবী। মহাউৎসাহে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন তাদেরকে।

বলেন তিনি, 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। মূর্তির উপাসনা ছেড়ে দাও। তোমরা কেবল মহান প্রতিপালকেরই ইবাদত করো।'

কিন্তু কিছুতেই তারা ভ্রুক্ষেপ করে না নূহ্ নবীর কথায়। যথারীতি অনাচার-পাপাচারে লিপ্ত থাকে তারা। তাদের অন্তর যেনো তাদের পূর্বপুরুষদের চেয়েও কঠিন। বিগত পুরুষ অপেক্ষা তারা যেনো আরো বেশী মজবুত। তাদের ঘিরে নবীর সকল প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

হজরত নূহ্ আ. আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে মোজেযা হিসেবে দীর্ঘ বয়স পেয়েছেন। সাড়ে নয় শত বছর হায়াত পেয়েছিলেন তিনি। তাই তিনি এক পুরুষের পর পরবর্তী পুরুষ— এভাবে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে পেরেছেন।

তেরো

দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার কার্য চালিয়ে হজরত নূহ্ আ. পেলেন মুষ্টিমেয় কিছু অনুসারী। তারপর নেমে এলো এক অনড় স্থবিরতা। শত চেষ্টা করেও ইমানদারদের সংখ্যা আর বাড়াতে পারলেন না তিনি। শেষে বাধ্য হয়ে

আল্লাহ্‌তায়ালার ভীষণ আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন তাদেরকে। বললেন, 'তোমরা এখনো ফিরে এসো বিভ্রান্তির পথ ছেড়ে। তা না হলে আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না।'

তাঁর এ কথায় বিষধর সাপের মত ফুঁসে উঠলো তাঁর সম্প্রদায়। তাদের আচরণে স্পষ্ট ঔদ্ধত্য ফুটে উঠলো।

তারা বললো, 'হে নূহ! তুমি আর আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করো না এবং আমাদের অবাধ্যতার জন্য তোমার আল্লাহ্‌কে বলে, যে আযাব আনতে পারো তা নিয়ে এসো।'

হজরত নূহ্‌ আ. তাদের প্রতিউত্তরে বললেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব আমার অধিকারে নেই। সেটা তো তাঁরই অধিকারে রয়েছে— যিনি আমাকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করা মাত্র সবকিছু হয়ে যাবে। তিনি যখন আযাব প্রেরণের ইচ্ছা করবেন, তখন কেউই তা রোধ করতে পারবে না।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়— 'তারা বলতে লাগলো, হে নুহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছো এবং যথেষ্ট ঝগড়া করেছো। এখন এর পালা শেষ করো। আর তুমি আমাদের সাথে (আল্লাহ্‌র আযাবের) যে ওয়াদা করেছো তা আনয়ন করো, যদি তুমি সত্যবাদি হও।'

নূহ্‌ আ. বললেন, আল্লাহ্‌পাক ইচ্ছা করলে সে আযাব অবশ্যই আনয়ন করবেন এবং তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না।

কওমের কথাবার্তা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান হজরত নূহ্‌। ভগ্নহৃদয়ে এদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা চিন্তা করে পেরেশান হন তিনি। ভাবেন শুধু, তারা শুনলো না কোনো কথা খোলা মন নিয়ে। বুঝতে চাইলো না, শুধু তর্ক করেই শেষ করে দিলো মূল্যবান মানবজীবন। অন্তর জুড়ে দুঃখের প্রবল স্রোত যেনো বয়ে যেতে থাকে হজরত নূহের।

অবশেষে বহুভাবে তাগিদ দিয়েও যখন তিনি তাঁর কওমকে প্রবল অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে ফিরাতে পারলেন না তখন আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে এ বিষয়ে অভিযোগ পেশ করলেন। বললেন, 'আমি ওদেরকে দিনে রাতে দলবদ্ধভাবে ও পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বোতভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি, কখনো জান্নাতের নেয়ামতরাজির প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছি— কখনো আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, আরো বলেছি ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি— কিন্তু তারা কর্ণপাত করলো না।'

কওমের নিদারুণ হঠকারিতায় নিতান্ত অপারগ হয়ে হজরত নূহ্ আ. আল্লাহ্তায়ালার দরবারে এই অভিযোগ পেশ করলেন। কী করবেন তিনি। তাঁর সম্প্রদায়কে বোঝানোর কোনো চেষ্টাইতো তিনি বাকি রাখেননি।

এখন শুধু অপেক্ষায় থাকেন তিনি। মহান প্রতিপালকের তরফ থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়।

দারুণ উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে সময় অতিবাহিত করেন হজরত নূহ। নবী-রসূলগণ তো তাঁদের সম্প্রদায়ের বিপরীতমুখী কার্যকলাপে সবসময়ই উৎকণ্ঠিত হয়ে দিন কাটান। কওমের ইমান প্রাপ্তি-সৎকাজে উৎসাহ যেমন তাঁদের আনন্দিত করে, তেমনিভাবে কওমের অস্বীকৃতি ও পাপাচার তাঁদেরকে একইভাবে করে তোলে বেদনাহত।

হজরত নূহ্ আ. আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত রসূল।

তাই তিনিও অপরাপর নবী-রসূলগণের ব্যতিক্রম নন। তাঁদের মতো তাঁকেও কওমের হঠকারিতা ভীষণভাবে ব্যথিত করে তোলে। এজন্যই উদ্বেগের মধ্যে তিনি দিন কাটান।

দিন যায়। রাত যায়। মাস যায়। বছরও গড়িয়ে যায়। তারপর যায় বছরের পর বছর। যায় যুগ। শতাব্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী।

একদিকে চলে নবীর সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন মূর্তি উপাসনা। অন্যদিকে নবী থাকেন তাদেরই হেদায়েতের চিন্তায় মশগুল।

হজরত নূহ্ আ. এর দুঃখ যেনো থিতিয়ে গেলো মহান প্রতিপালকের সান্ত্বনা বাণীতে। মহান প্রতিপালকের তরফ থেকে নবীর প্রতি এরশাদ হলো, 'আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরিত হলো, যারা ইমান আনার ছিলো (তারা ইমান) এনেছে। তারা ব্যতীত যারা আছে তারা কেউই (আর) ইমান আনবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপের জন্য (তুমি) দুঃখ করো না।'

আল্লাহ্তায়ালার পাঠানো ওহী পেয়ে ভগ্নহৃদয় নবী শান্ত হলেন। মহান প্রতিপালকের ঘোষণায় তার সমস্ত দুশ্চিন্তা কেটে যায় নিমিষেই।

তিনি তো তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য প্রচারে কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি। যথাসাধ্য প্রচেষ্টা তিনি অব্যাহত রেখেছেন বিপথগামী সম্প্রদায়কে পথে আনতে। বিনিময়ে পেয়েছেন অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন। চলার পথে কতোইনা অশ্রাব্য-কটু কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে। তবুও তিনি কওমের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন হক দ্বীনের দাওয়াত। দিনের পর দিন বিরতিহীনভাবে চলেছে তাঁর এই প্রেমময় প্রচেষ্টা।

সম্প্রদায়ের ইমান না আনার কারণ তো তাদের নিজেদেরই অবাধ্যতা। এ তো তাদেরই সত্যাগ্রহের যোগ্যতার ত্রুটি। হজরত নূহের দায়িত্বে ত্রুটি কোথায়?

এবার হজরত নূহ্ আ. তাঁর কওমকে নিয়ে অন্য রকম আশংকা করলেন। তিনি ভাবলেন, এরা যদি জমিনের উপর এভাবে নিজেদের খেয়াল খুশীমত বিচরণ করে, তাহলে পথপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকেও হয়তো গোমরাহ করে ফেলবে ধীরে ধীরে।

এ নিয়ে তিনি ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে। বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি কাফেরকুল থেকে কাউকেও জমিনের উপর অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদেরকে এভাবেই রাখেন— তবে এরা আপনার বিশ্বাসী বান্দাদেরকে গোমরাহ করে ফেলবে। আর তাদের বংশধরও তাদেরই মতো পাপিষ্ঠ ও নাফরমান পয়দা হবে।

দীর্ঘকাল কওমের প্রতি একটানা আহবান জানানোর পর তিনি বিফলমনোরথ হয়ে এই ফরিয়াদ করলেন। মুষ্টিমেয় ইমানদারদের ইমানের হেফাজতের জন্য তিনি আল্লাহ্তায়ালার দরবারে কওমের ফেতনা থেকে পরিত্রাণ চাইলেন।

চৌদ্দ

শেষ পর্যন্ত হজরত নূহ্ আ. এর কওমের ব্যাপারে আল্লাহ্তায়ালার ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেলো।

যুগের প্রিয়তম বন্দা হজরত নূহ্ আ. এর ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো।

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন যে, অতি শীঘ্রই তাদের উপর ভয়ংকর আযাব নেমে আসবে। যারা নবীর কথা অবিশ্বাস করেছে তাদের কেউই তা থেকে রেহাই পাবে না।

এদিকে প্রকৃতি যেনো বিমর্ষ রূপ ধারণ করেছে অজানা আশংকায়। কিন্তু তার কওম তখনও নির্বিকার এসব থেকে। স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের পাপানুষ্ঠানসমূহ চালিয়ে যাচ্ছে।

যথাসময়ে হজরত নূহ্ আ. মহান প্রতিপালকের আদেশ পেলেন নৌকা তৈরী করার জন্য। যাতে করে বাহ্যিক উপকরণ হিসাবে নৌকায় উঠে তিনি এবং তার অনুগত মুমিনগণ আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

সে কথাই মহান প্রতিপালক জানালেন এভাবে— 'হে নূহ্! তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করতে থাকো। আর আমাকে সম্বোধন করে জালিমদের জন্য কোনো সুপারিশ করো না। নিঃসন্দেহে তারা নিমজ্জিত হবে।'

নৌকা নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন হজরত নূহ্ আ.। কিন্তু কীভাবে তিনি নৌকা তৈরী করবেন? এ বিষয়ে কিছুইতো জানেন না তিনি। তিনি তো আগে কখনো নৌকা তৈরী করেননি। চিন্তিত হন নবী।

সাহায্য এসে যায় মহান প্রতিপালকের কাছ থেকে। আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশে হজরত জিব্রাইল আ. এলেন। হজরত নূহ্ আ.কে নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। হজরত নূহ্ আ. দ্রুত রপ্ত করে নিলেন এ বিদ্যা।

নৌকা নির্মাণ শুরু হলো। অনেক কাঠ যোগাড় করলেন হজরত নূহ। আরো যোগাড় করলেন প্রচুর লোহার পেরেক— যাতে করে একটা কাঠের সঙ্গে আরেকটা কাঠ জুড়ে দিয়ে নৌকার কাঠামো তৈরী করা যায়। নৌকা নির্মাণের প্রস্তুতি সমাপ্ত হলো তাঁর।

এগিয়ে চললো নৌকা তৈরীর কাজ।

তাঁর এই কর্মকাণ্ড কাফের সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এড়ালো না। অদম্য কৌতূহল নিয়ে তারা নবীর নৌকা নির্মাণের কাজ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তারা তা দেখে নিশ্চুপ রইলো না। নবীর বিরুদ্ধে নানারকম বিদ্রুপাত্মক কথা বলে বেড়াতে লাগলো তারা। কথার আঘাতে তারা জর্জরিত করতে লাগলো তাঁকে।

যখনই নির্মীয়মান নৌকার কাছ দিয়ে তারা যাতায়াত করে, তখনই তারা এ বিষয় নিয়ে শুরু করে হাসি তামাশা।

এক পর্যায়ে তারা নবীকে জিজ্ঞেস করে, হে নূহ! এ তুমি কি করছো? অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে। তাই নৌকা তৈরী করছি— জবাব দিলেন তিনি।

কিন্তু তাঁর উত্তর তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। তারা নবীকে বললো, 'এখানো তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ, আর তুমি নৌকা চালাবার ফিকিরে আছো?'

কেউ কেউ বললো, 'চমৎকার! আমরা যখন ডুবতে থাকবো, তখন তুমি ও তোমার অনুসারীরা বুঝি এই নৌকায় আরোহণ করে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেমন নির্বোধ কল্পনা তোমার।'

হজরত নূহ্ আ. তাদের পরিণাম সম্বন্ধে অসতর্কতা এবং আল্লাহ্তায়ালার নাফরমানীর দুঃসাহস দেখে থমকে যান। কিন্তু পরমুহূর্তেই দৃঢ়তার সাথে তাদের এ কথার জবাব দেন— যেমন তোমরা আমাদেরকে বিদ্রুপ করছো, তেমনি আমরাও একদিন তোমাদেরকে বিদ্রুপ করবো।'

তিনি তাদেরকে আরো বলেন, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার উপর শাস্তি আপতিত হয়।

হজরত নূহ্ আ. যদিও বলেছেন যে, আমরাও একদিন তোমাদেরকে বিদ্রুপ করবো— একথার অর্থ এরকম হবে যে, তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতপক্ষে নবীরা কখনো কাউকে বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী কাজ।

মূর্খের দল নবীর সঙ্গে শুধু বাদানুবাদ করে যেতে লাগলো। নবীর দীর্ঘদিনের সৎপথে আহ্বানেও যখন তাদের মতিগতির কোনো পরিবর্তন হলো না, আল্লাহ্তায়ালার আযাব তাদের জন্য নির্ধারিত হওয়ার পর তাদের কাছ থেকে আর কিই বা আশা কার যায়।

বহু আগেই নবীকে হতাশ করেছে তারা। চরম নৈরাশ্য ছাড়া তাদের কাছ থেকে পাওয়ার আর কিছুই নেই। পাপাচারের সমস্ত সীমাই তারা লংঘন করে ফেলেছে।

নৌকা নির্মাণ শেষ হলো একসময়।

এদিকে অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্পাকের নির্ধারিত আযাবের সময়ও ঘনিয়ে এলো।

ইতোমধ্যেই মহান প্রতিপালক হজরত নূহ আ.কে আযাব আরম্ভ হওয়ার নিদর্শন সম্পর্কে ওহী মারফত জানিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'যখন আমার আযাব আরম্ভের সময় হবে এবং (তার নির্দশন এই যে) যমীন বিদীর্ণ হয়ে পানি উঠতে শুরু করবে।'

সে সময়ে নবীর করণীয় কাজ সম্পর্কেও মহান প্রতিপালক জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'তখন প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীর এক একটি জোড়া এবং আপনার পরিজনকে নৌকায় উঠিয়ে নেবেন— তাদের মধ্যে (যে আমার বিদ্রোহী) যার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আমার আদেশ হয়ে গিয়েছে সে উঠতে পারবে না। আর যারা অন্যায়কারী, বিদ্রোহী তাদের সম্পর্কে আপনি আমার কাছে কোনো অনুরোধ করবেন না— তাদেরকে অবশ্যই ডুবিয়ে মারা হবে।'

হজরত নূহ আল্লাহ্তায়ালার সতর্কবাণী তাঁর ইমানদার সঙ্গীদেরকে জানিয়ে দিলেন এবং তিনি তাদের নিয়ে আসন্ন প্লাবনমুক্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পরিবারের লোকজনকেও সতর্ক করে দিলেন। তাঁর স্ত্রী ও একপুত্র বাদে অন্যান্য পুত্ররা হজরত নূহ আ. এর অনুসারী ছিলেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র আগে থেকেই ইমান আনতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলো। শেষ পর্যন্ত কাফেরই থেকে গেলো তারা।

এক সময় হজরত নূহ্ আ. ও অন্যান্য ইমানদারদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। প্রস্তুত হলেন বিশ্বাসীর দল। এবার শুধু অপেক্ষার পালা।

তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত আযাবের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন।

পনেরো

এলো সেই দিন।

মুখরিত জনপদে প্রাত্যহিক কাজ কর্মে ব্যস্ত সবাই। কাফের মুশরেকরা নির্ভয়ে চলাফেরা করছে লোকালয়ে। রোজকার মতো আজও তারা মূর্তির উপাসনায় লিপ্ত। অন্যান্য পাপানুষ্ঠানও তারা সম্পাদন করছে যথারীতি। এদিকে হজরত নূহ আ. এর সময় কাটে আসন্ন আযাবের উৎকণ্ঠায়।

এক সময় নবী ও তাঁর সঙ্গীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, জমিন বিদীর্ণ হয়ে পানি উথলে উঠছে। ভাবেন তাঁরা এটাই আল্লাহ্তায়ালার জানিয়ে দেয়া নির্ধারিত আযাবের নিদর্শন। আর দেরী নেই। প্লাবন শুরু হবে এবার। মহাপ্লাবন।

এবার তাদের নৌকায় আরোহণ করতে হবে।

হজরত নূহ্ আ. আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক একটি জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর ইমানদার সঙ্গীদেরকে বললেন, 'নৌকায় আরোহণ করো, আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দয়ালু ও ক্ষমতাসীল।'

নৌকায় আরোহণ করলেন সবাই।

হঠাৎ করেই নতুন রূপে সজ্জিত হলো পৃথিবী। প্রকৃতির রুদ্ররূপ প্রষ্ফুটিত হচ্ছে দ্রুতলয়ে। শান্ত চরাচর ক্রমশঃ অশান্ত হয়ে উঠতে লাগলো। বিদীর্ণ মৃত্তিকা থেকে উদগত পানিতে সয়লাব হতে শুরু করলো মাঠ, প্রান্তর, জনপদ—সবকিছু। খোলা আকাশ থেকে তীব্র বৃষ্টিবর্ষণ জলপ্রপাতের মতো নামতে শুরু করলো।

পানি বাড়তে লাগলো ক্রমশঃ। দিগন্ত জুড়ে কেবল পানি আর পানি। কী ভয়াবহ তার রূপ!। যেনো কোটি কোটি পানির পাহাড় আছড়ে পড়ছে পরস্পরের উপর।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'সুতরাং আমি অতিবর্ষণকারী পানির সাথে আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম এবং পৃথিবীতে নদী বইয়ে দিলাম।'

সেই পানির উপর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী ইমানদাররা যাবতীয় জীবসহ ভাসতে শুরু করলো। হজরত নূহ্ এবং তাঁর সঙ্গীরা এ ভয়াবহ আযাব থেকে নৌকায় উঠিয়ে তাঁদেরকে সুরক্ষিত করার জন্য মহান প্রতিপালকের দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। কালো পানির বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে শহর, নগর, গ্রাম, জনপদ— সবকিছু।

তাঁরা দুচোখ ভরা ভয় আর বিস্ময় নিয়ে নৌকা থেকে এ আযাব প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

আহবান অগ্রাহ্য করলো হজরত নূহ্ আ. এর সেই অবাধ্য পুত্র। নৌকায় ওঠবার কোনো চেষ্টাও করলো না সে। নবী ডাকলেন তাকে। কিন্তু সেই অবাধ্য পুত্র সাড়া দিলো না নবীর ডাকে। বরং সে বললো, আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করবো।'

'আজকে কোনো উচুঁ পর্বত কাউকে আল্লাহ্‌তায়ালার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা' পুত্রকে জানিয়ে দিলেন নবী। এও বললেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালার খাস রহমত ছাড়া আজ আর বাঁচবার অন্য কোনো উপায় নেই।'

দূর থেকে পিতাপুত্রের কথাবার্তা চলছিলো। এমনি সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করলো। তারপর ঢেউয়ের এক বিশাল ঝাপটায় নিশ্চিহ্ন হলো সে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো চিরদিনের জন্য।

হজরত নূহ্ আ. এর পুত্রের প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা মহাগ্রন্থ কোরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে এভাবে, 'নূহের এক পুত্র নৌকা থেকে দূরে ছিলো। নূহ তাকে ডেকে বললেন, হে স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে এসো, কাফেরদের সঙ্গে থেকো না। পুত্র উত্তর দিলো, এখনই আমি পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছি। পাহাড় আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। নূহ বললেন, আজ আল্লাহ্‌র আযাব থেকে কেউই রক্ষা পাবে না, অবশ্য আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন (সে ছাড়া)। ইতোমধ্যে একটি বিরাট তরঙ্গ এসে উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হলো— পুত্র ডুবে গেলো।'

হজরত নূহ আ. (এ অবস্থায়) স্বীয় পরওয়ারদিগারের কাছে দরখাস্ত করলেন— 'হে প্রভু! আমার ছেলেতো আমার পরিবারেরই একজন এবং আপনার ওয়াদা সত্য— আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বোপরি এখতিয়ারের মালিক।'

আল্লাহ্ বললেন, 'হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে তোমার আদর্শের বিপরীত— অসৎকর্মপরায়ণ (সে ধ্বংস হবেই)। অতএব যে বিষয়ে তুমি অবগত নও, সে বিষয়ে আমার কাছে ফরিয়াদ করো না। আমি তোমাকে নসীহত করি, অজ্ঞ লোকদের মতো কাজ করো না।'

এরপর হজরত নূহ আ. বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি আর যেনো আপনার কাছে দরখাস্ত না জানাই যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ। এবং যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, আমার প্রতি দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হয়ে যাবো।'

এ প্রসঙ্গে কাসাসুল কোরআন গ্রন্থের বর্ণনা এরকম— যেহেতু হজরত নূহ আ. নিজ স্ত্রীর আনুপূর্বিক কুফুরী আকিদা ও আচরণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী প্রকৃতভাবে ইমান আনবে এবং তৌহিদের ডাকে সাড়া দিবে। কাজেই বাদ পড়ার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্ত্রীকেই মনে করলেন। পক্ষান্তরে পুত্রের প্রতি অপত্য স্নেহবশতঃ তিনি মনে করলেন— এখন মাতার অনুগামী হলেও নৌকায় আরোহণ করার পরবর্তী সময়ে মু'মিনদের সংসর্গে প্রভাবিত হয়ে হয়তো সে ইমান আনতে পারে। এ ভেবে তিনি আল্লাহ্পাকের বাণী (এবং তোমার খানদানকেও উঠিয়ে নাও) এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলেন। এবং আল্লাহপাকের দরবারে পুত্রের পরিত্রাণের জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু আল্লাহ্পাক স্বীয় উচ্চমর্যাদাশালী পয়গম্বরের এই অনুমান পছন্দ করলেন না। তিনি হজরত নূহ্ আ.কে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন।

যেনো আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক হজরত নূহ্ আ.কে এরূপ সম্বোধন করা আসলে ধমক বা তিরস্কার স্বরূপ নয়। বরং মূল তথ্যের দিকে তাঁর প্রতি লক্ষ্য করার আহ্বান ছিলো। যা শুনে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মানবতা ও আল্লাহ্তায়ালার অনুগত বান্দা হওয়ার স্বীকারোক্তির সাথে সাথে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। একই সাথে আল্লাহ্তায়ালার তরফ থেকে সালামতি ও বরকত লাভ করে আনন্দিত ও সফলকাম হলেন।

অতএব, এতে গুনাহের কোনো প্রশ্নই নেই এবং এ ঘটনা নবী ও রসূলদের নিষ্পাপ হওয়ার বিরোধীও নয়। এ কারণেই আল্লাহ্পাক একে অজ্ঞতা শব্দে ব্যক্ত করেছেন। গুনাহ্ বা অবাধ্যতা শব্দ তিনি প্রয়োগ করেননি।

ষোল

হজরত নূহ্ আ. এর নির্মিত নৌকা তাঁকে এবং তাঁর অল্প সংখ্যক অনুসারী ইমানদারদের নিয়ে অথৈ পানিতে ভাসতে লাগলো।

যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকেই শুধু পানি আর পানি। দিগন্তপ্লাবিত পানিতে মুছে গেছে পর্বতের শৃঙ্গ রেখা। অরণ্যের বৃক্ষ-বৈভব। বাজার। বন্দর। মুখরিত জনপদ।

আল্লাহ্তায়ালার নির্ধারিত আযাবে সমস্ত পৃথিবী আজ ডুবে গেছে প্লাবনের পানিতে। সেই সাথে ডুবে গেছে হজরত নূহ্ আ. এর সীমালংঘনকারী কাফের মুশরেক সম্প্রদায়। চরাচর জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে কালো পানির এক বিশাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র। উপরে ঘন কালো মেঘে ঢাকা বর্ষণমুখর আকাশ। নিচে মহাসাগর। উপরে পানি। নিচে পানি। শুধুই পানি। শুধুই প্লাবন। মহাপ্লাবন। কোথাও জনমানবের কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। হঠকারী সম্প্রদায়ের হঠকারিতা তাদের অস্তিত্বের মতোই সলিল সমাধি লাভ করেছে চিরদিনের জন্য।

শুধু জেগে আছে মুক্তির একক নিদর্শন— হজরত নূহ আ. এর অবাক কিশতি। নাজাতের একমাত্র উপকরণ। বিশ্বাসীদের প্রতি কী অপার অনুগ্রহ প্রভুপরোয়ারদিগারের। কৃতজ্ঞতার অনির্বাণ জ্যোতিতে ভরে যায় নৌকাবাসীদের বুক। আরোহীরা শোকর আদায় করেন আল্লাহ্তায়ালার। সেই পবিত্র সত্তার জন্যই সকল প্রশংসা। সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। সোবহানাল্লাহিল আজীম।

দিন যতো যায়, প্লাবনের রূপ হয়ে ওঠে ততো বেশী ভয়ংকর। পানি বাড়তে থাকে। বৃষ্টিও ঝরতে থাকে আকাশ ভেঙে। এ প্লাবনের শেষ কোথায়?

নৌকায় অবস্থানরত ইমানদারেরা এক সময় হারিয়ে যান স্মৃতির পাতায়— ভেসে ওঠে এক এক করে অদূর অতীতের জ্বলজ্বলে ঘটনাবলী। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে পৃথিবীতে একত্রে বসবাস করছিলেন তারা। কিন্তু ইমান না আনার কারণেই আজ তারা ইমানদারদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাপ্লাবনের পানিতে তলিয়ে গেছে।

হকের সাথে বাতিলের সহঅবস্থান তো শুধু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই থাকে— তারপর সব আলাদা হয়ে যায়। হক-বাতিলের সহঅবস্থান তো কেবল এই পৃথিবীতেই হওয়া সম্ভব, আখেরাতে তো সবাই দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। হক-বাতিল আলাদা করে দেয়া হবে তখন।

আরো ভাবেন তারা— মহান প্রতিপালক তাদেরকে সরল পথে প্রত্যাবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন। কওমের প্রতি হজরত নূহ্ আ. এর মতো একজন নবী-রসূল পাঠিয়েছেন তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করার জন্য। কিন্তু কি করলো তারা। শয়তানের প্ররোচনায় দিগভ্রান্ত হয়ে হজরত নূহ্ আ. এর দীর্ঘদিনের সৎপথে আহ্বান সত্ত্বেও তাঁর কথায় তারা-কর্ণপাত করলো না। শুধু মূর্তি উপাসনার মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ালো তারা। উপরন্তু তারা নবীর প্রতি কতো রকম কটুক্তি করেছে। সত্যপ্রচারক হজরত নূহ আ. এর গায়ে হাত তুলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। নবীর হেদায়েতের সমস্ত প্রচেষ্টাই তারা হঠকারিতা করে নস্যাৎ করে দিয়েছে। পথপ্রাপ্তির সমস্ত সুযোগ পদদলিত করার পরেই না তাদের উপর নেমে এসেছে আল্লাহ্তায়ালার এই আযাব।

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক কাউকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না। একথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে পরিষ্কারভাবে।

মুক্তিলাভের পথে রক্তের সম্পর্কই যথেষ্ট নয়। বিশ্বাসের সম্পর্ক-হৃদয়ের সম্পর্ক প্রয়োজন। তাই এরশাদ হয়েছে, 'সেদিন ধন সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, পরিজন কোনো কাজে আসবে না। আসবে শুধু প্রশান্ত অন্তর।'

ইমানের আলোয় আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে লিপ্ত থেকে যে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে, তাই সেদিন-সেই ভয়াবহ কেয়ামতের দিন কাজে আসবে।

জগত সংসার আখেরাতের কর্মক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্রের ফলাফলের জন্য আখেরাত নির্দিষ্ট রয়েছে। তবুও জুলুম ও অহংকার এ দুটি মন্দ কাজের জন্য শাস্তি কোনো না কোনো প্রকারে দুনিয়াতেই এসে পড়ে।

ইমাম আবু হানিফা র. বলেন, 'জালিম ও অহংকারী লোকেরা মৃত্যুর পূর্বেই নিজেদের জুলুম ও অহংকারের কিছুনা কিছু শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং অপমান ও বিফলতার সম্মুখীন হয়।'

আল্লাহ্পাকের সত্য নবী ও রসূল হজরত নূহ আ. কে কষ্ট প্রদানকারী— সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের পাপাচার এবং তার ফলে তাদের সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া— এ বক্তব্যেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হজরত নূহ্ আ. এর সম্প্রদায় এমনই এক সম্প্রদায় যে, তারা শুধু পার্থিব আযাবের সম্মুখীন হলো না— পার্থিব আযাব ভোগ করতে করতে তারা চলে গেলো আখেরাতের অনন্ত আযাবের দিকে।

হজরত নূহ্ আ. তাঁর ইমানদার সঙ্গীরাসহ নৌকায় করে প্লাবনের পানিতে অবিরাম ভেসে যেতে লাগলেন। এরই মাঝে তাঁরা কতো তলিয়ে যাওয়া জনপদ, মরু-মরুদ্যান, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় ভেসে চলেছেন তাঁরা জানা নেই তাঁদের। কোথায় যে এই ভেসে চলার সমাপ্তি ঘটবে— তাও জানা নেই। শুধু মহান প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় সময় অতিবাহিত করেন তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে মহান প্রতিপালকের সর্বময় ইচ্ছায় সমর্পিত থাকেন যাঁরা, তাঁরাতো নিজেদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেন না কখনো। আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছায়ই তাঁরা পরিচালিত হন।

প্রবল তুফানের মধ্য দিয়ে হজরত নূহ্ আ. এর নৌকা চলতে চলতে একসময় কাবা শরীফের নিকটবর্তী হলো। তারপর সাতবার কাবা শরীফ তওয়াফ করলো।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহান প্রতিপালক প্রচণ্ড প্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছেন।

হজরত নূহ আ. এর নির্মিত নৌকা কাবা শরীফ তওয়াফ শেষে তাঁদের নিয়ে আবার যাত্রা করলো নিরুদ্দেশের পথে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলো। তবুও যেনো বিরাম নেই তাঁদের এই প্লাবন-পরিক্রমার।

মুষলধারে বৃষ্টি-পৃথিবী ভেদ করে ওঠা পানির পাহাড় প্রমাণ ঢেউ-কেবলই ভাসিয়ে নিয়ে চলে তাঁদের। কখনো দ্রুতগতি কখনো বা ধীর গতিতে অবিরাম চলতে থাকে তাঁদের নৌকা। নৌকার যাত্রীরা ভাবতে থাকেন, কবে শেষ হবে এই আযাবের মহাপ্লাবন। কখন আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে অবিরাম বৃষ্টিপাত থেমে যাবে। কখনই বা আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে জমিন থেকে উদগত পানি সরে যাবে। তিনিই জানেন কেবল। বিশ্ব প্রতিপালকই জানেন একথা। আর যখন নবীর কাছে ওহী আসবে তখনই শুধু তাঁরা জানতে পারবেন এ প্রশ্নের জবাব।

সেই প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন হজরত নূহ্ আ. এবং তাঁর সঙ্গীরা।

সতেরো

একসময় প্রত্যাশিত আদেশ এসে গেলো মহান প্রতিপালকের তরফ থেকে। আল্লাহ্তায়ালা আদেশ দিলেন,

'হে পৃথিবী! শোষণ করে নাও তোমার উদগত পানি এবং হে আকাশ! বর্ষণ বন্ধ করো।'

আল্লাহ্তায়ালার আদেশ অনুযায়ী সেই প্রলয়ংকরী প্লাবনে ভাটা পড়লো। স্তিমিত হয়ে এলো প্লাবনের প্রচণ্ডতা।

তাফসীরে কুরতুবী ও তাফসীরে মাযহারীতে এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে— অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি পৃথিবী উদগীরণ করেছিলো সে সম্পর্কে হুকুম দেয়া হলো যেনো পৃথিবী তা শুষে নেয়। আকাশকে অর্থাৎ মেঘমালাকে আল্লাহ্তায়ালা নির্দেশ দিলেন ক্ষান্ত হও-বারিবর্ষণ বন্ধ করো–ফলে বৃষ্টিপাতও বন্ধ হলো। পৃথিবীর পানি ভূঅভ্যন্তরে চলে গেলো আর আসমান হতে ইতোপূর্বে বর্ষিত পানি নদ-নদীর আকার ধারণ করলো যার দ্বারা পরবর্তীকালে মানব সমাজ উপকৃত হতে পারে।

হজরত নূহ্ আ. ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীরা মহাদুর্যোগ থেমে যেতে দেখে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন এবং নৌকা থামার লক্ষণ দেখা দিলে মাটিতে অবতরণের জন্য তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন। কতোদিন হয়ে গেলো তাঁরা মাটির উপরে থেকেও যেনো মাটির পরশ পাননি।

আবার মাটি স্পর্শ করতে পারবেন-মৃত্তিকায় পদবিক্ষেপ করতে পারবেন একথা ভেবে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান।

অবশেষে তাঁদের নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে ভিড়লো।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনায়— 'আর আল্লাহ্পাকের আদেশ পূর্ণ হলো এবং নৌকা জুদী পাহাড়ে গিয়ে থামলো। আর ঘোষণা করে দেয়া হলো, জালিম কওমের জন্য ধ্বংস।'

জুদী পাহাড় প্রসঙ্গে তওরাত কিতাবে বলা হয়েছে— জুদী আরারাত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অন্যতম পর্বত। আরারাত আসলে দ্বীপের নাম। অর্থাৎ এটা সেই অঞ্চলের নাম, যা দজলা ও ফোরাত নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দিয়ারে বিকর হতে বাগদাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইমাম বোখারীও লিখেছেন যে, জুদী পর্বত একটি বিশেষ দ্বীপে অবস্থিত। ক্কাসতালানী (বোখারী শরীফের শরাহ্) নামক কিতাবে ঐ দ্বীপকে ইবনে ওমর দ্বীপ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোনো কোনো ভূগোল বিশারদ এই পর্বতকে ইরাকের অন্তর্গত 'মাওছেল' অঞ্চলে অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন।

বিভিন্ন নাম দেখে এসব উক্তিকে বিভিন্ন বলা যায় বটে কিন্তু মানচিত্রে দেখা যায়, উল্লেখিত স্থানগুলি সবই কাছাকাছি এবং 'মাওছেল' অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের উত্তরাংশের প্রদেশ 'মাওছেল' (বাংলা মানচিত্রে মোসল-বর্তমানে তেল সমৃদ্ধ) এলাকা । এই এলাকাটি পশ্চিমে সিরিয়া পূর্বে ইরান ও উত্তরে তুরস্ক দ্বারা বেষ্টিত।

এটা 'মাওছেল' এলাকার উত্তর সীমান্তে দজলা (তাইগ্রীস) ও ফোরাত (ইউফ্রেটীস) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী পূর্বপ্রান্তে অর্থাৎ দজলা নদীর কূলে 'ইবনে ওমর দ্বীপ' অবস্থিত।

এরই অনতিদূরে 'মাওছেল' এলাকার উত্তর পূর্ব সীমান্তে 'আরারাত' পর্বতমালা এবং এর সীমানা সংলগ্নই কুর্দীস্তান' (যা তুরস্কস্থ আর্মেনিয়া এলাকার দক্ষিণ পূর্ব সীমানায় 'মাওছেল' এলাকা সংলগ্ন) পার্বত্য এলাকা।

এই নিকটবর্তী ও লাগালাগি বিভিন্ন নামের স্থানসমূহের এলাকাতেই জুদী পর্বত অবস্থিত।

মোট কথা-এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকস্থিত মাওছেল এলাকার উত্তর সীমান্তে হজরত নূহ্ আ. এবং তাঁর ইমানদার সঙ্গীরা তাঁদের সে নৌকা থেকে নেমেছিলেন।

নৌকা হজরত নূহ্ ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে জুদী পর্বতে ভিড়ার পর আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে আদেশ করলেন— 'হে নূহ! অবতরণ করুন শান্তি ও সর্বপ্রকার কল্যাণ সহকারে (আপনার উপর এবং আপনার সঙ্গীদের উপর)। পক্ষান্তরে (পরবর্তীদের মধ্যে) এমন একটি দলও হবে যাদেরকে আমি উপস্থিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করবো, তৎপর তাদের উপর আমার তরফ থেকে পৌঁছবে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব।'

আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশ অনুযায়ী হজরত নূহ্‌ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নৌকা থেকে অবতরণ করলেন তাঁরা শান্তি ও র্সপ্রকার কল্যাণ সহকারে।

হজরত নূহ্‌ আ. এর নৌকায় আরোহণ ও অবতরণ প্রসঙ্গে তাফসীরে তাবারী ও বগবীতে বর্ণিত আছে যে, হজরত নূহ্‌ আ. ১০ই রজব নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ছয়মাস উক্ত নৌকা তুফানের মধ্যেই চলেছে। পরিশেষে ১০ই মুহররম অর্থাৎ আশুরার দিন নৌকা জুদী পাহাড়ে ভিড়লো। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা রোজা পালন করেন সেদিন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, নৌকায় অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোজা পালন করেছে।

বর্ণনায় ভিন্নতা থাকলেও এ সমস্ত বর্ণনায় একই বিষয়বস্তু প্রতিভাত হয়। সরলপ্রাণ ঈমানদারগণ এ থেকে কখনো যুক্তি তর্কের উপকরণ খোঁজেন না। শুধু বক্রহৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এ থেকে কুটতর্কের অবতারণা করে থাকে।

আঠার

প্লাবন শেষে হজরত নূহ আ. ও তাঁর ইমানদার সঙ্গীদের নৌকা থেকে অবতরণের প্রসঙ্গে তাফসীরের কিতাবের বর্ণনা এ রকম—

হজরত নূহ্‌ আ. কে সদলবলে পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে অবতরণের হুকুম দিয়ে বলা হলো, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। কেনোনা আপনার প্রতি আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা থাকবে। সর্বপ্রকার বিপদ আপদ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো আপনাকে এবং আপনার ধন সম্পদ ও আওলাদ ফরজন্দদের মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্যের নিশ্চয়তা দেয়া হলো।

কোরআনুল করীমের এরশাদ অনুযায়ী— প্লাবন পরবর্তী সময়ের সমস্ত মানবমণ্ডলী হজরত নূহ্ আ. এর বংশধর থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর শুধু তাঁর বংশধরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছি।' এ জন্যই ইতিহাসবেত্তাগণ তাঁকে দ্বিতীয় আদম বা ছানি আদম উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

নিরাপত্তা ও বরকতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা শুধু হজরত নূহ্ আ. এর সাথেই সীমাবদ্ধ নয়।

বরং এরশাদ হয়েছে, 'আর আপনার সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপরও সালামতি ও বরকত রয়েছে।'

এখানে তাঁর সহযাত্রী ইমানদারগণকে উম্মতের বহুবচন হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, নৌকার আরোহীগণ অধিকাংশ হজরত নূহ্ আ. এর খান্দানের লোক ছিলেন। আঙুলে গোণা কয়েকজন মাত্র ছিলেন অন্য বংশের লোক। এতদসঙ্গে বোঝানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের বংশধরগণকে সালামতি ও বরকতের শামিল করা হয়েছে। অতএব, এখানে সালামতি ও বরকতের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেনোনা ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যেমন মু'মিন থাকবে তদ্রূপ বহুজাতিক কাফের-মুশরেক ও নাস্তিকও থাকবে।

মু'মিনদের জন্য তো দুনিয়া ও আখেরাতে সালামতি ও বরকত রয়েছে। কিন্তু তাঁদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের-মুশরেক ও নাস্তিক তারা তো জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

সুতরাং তাদের জন্য নিরাপত্তা ও বরকত কীভাবে হতে পারে। আয়াতের শেষ বাক্যে এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, অন্যান্য সম্প্রদায়কে আমি পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য দান করবো। সর্বপ্রকার ভোগ বিলাসের সামগ্রী দ্বারা সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিবো। কেনোনা পার্থিব নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য সাধারণ দস্তরখান স্বরূপ— শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবাই তা উপভোগ করতে পারে।

অতএব নৌকা আরোহীগণের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের হবে তারাও এর অংশীদার হবে।

কিন্তু আখেরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী শুধু ইমানদারদের জন্য সংরক্ষিত। কাফেরদের সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান তাদেরকে ইহজগতেই বুঝিয়ে দেয়া হবে।

অতএব আখেরাতে তাদের উপর আল্লাহ্তায়ালার আযাবই নির্ধারিত রয়েছে।

ঊনিশ

হজরত আদম আ. এর পর হজরত নূহ্ আ. প্রথম নবী যাকে প্রথম রসূলের পদ দান করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম শরীফের শাফাআতের অধ্যায়ে হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বর্ণিত আছে, 'হে নূহ! তোমাকে প্রথিবীতে সর্বপ্রথম রসূল বানানো হয়েছে।'

নসবনামা সম্বন্ধীয় বিদ্যায় অভিজ্ঞ মনীষীগণ হজরত নূহ্ আ. এর বংশসূত্র এরূপ বর্ণনা করেছেন—

নূহ্ ইবনে লা-মাক ইবনে মুতাওশালেহ ইবনে আখনুখ ইবনে ইয়ারুদ ইবনে ক্বীনান ইবনে আনুশ ইবনে শীশ ইবনে আদম।

যদিও ঐতিহাসিকগণ এবং তাওরাত এই বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বরং বিশ্বাসের সাথে বলা যেতে পারে যে, হজরত আদম আ. হজরত নূহ্ আ. এর মধ্যস্থলে উপরোক্ত বংশসূত্রের চেয়ে আরো অধিক বংশসূত্র রয়েছে।

মুস্তাদরাক হাকেমে হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হজরত আদম আ. ও হজরত নূহ আ. এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে।

এ বিষয়বস্তুই তিবরানী হজরত আবু যর রা. এর বাচনিক রসুলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন (তাফসীরে মাযহারী)।

একশ বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়।

ইবনে জরীর বর্ণনা করেন, হজরত নূহ আ. এর জন্ম হজরত আদম আ. এর আটশ' ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল।

আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিলো নয়শ পঞ্চাশ বছর।

হজরত আদম আ. এর বয়স এক হাদিসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে।

এভাবে হজরত আদম আ. এর জন্ম থেকে হজরত নূহ্ আ. এর ওফাত পর্যন্ত মোট দুহাজার আটশ' ছাপ্পান্ন বছর হয় (মাযহারী)।

হজরত নূহ্ আ. এর আসল নাম 'শাকের'। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোনো রেওয়ায়েতে আব্দুল গাফার বর্ণিত হয়েছে।

হজরত নূহ্ আ. কোন সময়ে তাঁর কওমকে আহবানের কাজ চালিয়েছেন— এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হজরত ইদ্রীস আ. এর পূর্বে ছিলো, না পরে।

অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন (বাহরে মুহীত)।

মুস্তাদরাক হাকেমে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, নূহ্ আ. চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

বিশ

ওলামায়ে ইসলামের একটি জামাত, ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের আলেমগণ এবং জ্যোতির্বিদ ও ভূতত্ত্ববিদ জড়জগতের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত যে, এই প্লাবন সমগ্র পৃথিবীর উপর আসেনি— বরং পৃথিবীর সেই অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো— যেখানে হজরত নূহ্ আ. তাঁর কওমসহ বাস করতেন। আর সেই অঞ্চলটির আয়তন একলক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার।

তাদের মতে হজরত নূহ্ আ. এর প্লাবন নির্দিষ্ট এলাকায় হওয়ার কারণ এই যে, যদি এই প্লাবন ব্যাপক হতো তবে তার চিহ্নসমূহ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন পর্বত চূড়ায় পরিলক্ষিত হওয়া উচিত ছিলো। অথচ এরূপ হয়নি।

তাছাড়াও সেখানে মানুষের বসতি খুবই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং তা সেই অঞ্চলেই ছিলো যেখানে হজরত নূহ্ ও তাঁর কওম বাস করতো।

তখনও হজরত আদম আ. এর আওলাদের সংখ্যা সে অঞ্চলে বসবাসকারীদের চেয়ে অধিক ছিলো না। ফলকথা সেখানকার অধিবাসীরাই ছিলো হজরত আদম আ. এর সমগ্র বংশধর।

এ অঞ্চলের বাইরে কোথাও মানুষের বসতি ছিলো না। সুতরাং সেই অঞ্চলটিই আযাবের উপযোগী ছিলো এবং তাদেরই উপর এই আযাব প্রেরিত হয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সাথে এই প্লাবনের বা আযাবের কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

আর কোনো কোনো ওলামায়ে ইসলামের বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদগণের এবং কোনো কোনো জড়বাদী ঐতিহাসিকদের মতে এই প্লাবন সমগ্র ভূপৃষ্ঠের উপর ব্যাপক ছিলো। আর এই ব্যাপক প্লাবন শুধু একটিই নয় বরং তাদের মতে এই ভূপৃষ্ঠের উপর এই শ্রেণীর বহু প্লাবন এসেছিলো। আর তারা উপরোক্ত প্রথম মতাবলম্বীদের চিহ্নসমূহ সংক্রান্ত প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, জজিরা ইরাকে আরবের অংশটুকু ছাড়াও উঁচু পর্বতসমূহের উপরও এমন প্রাণীসমূহের দেহ পিঞ্জর এবং হাড়সমূহ অনেক পাওয়া গিয়েছে যাদের সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদগণের অভিমত এই— এগুলো জলজ প্রাণী। এরা শুধু পানিতেই জীবিত থাকতে পারে। পানির বাইরে এক মুহূর্তও তাদের জীবিত থাকা কঠিন।

সুতরাং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পর্বতের সেই চূড়াসমূহের উপর ঐ সমস্ত বস্তুসমূহের অস্তিত্ব এ কথার প্রমাণ যে, কোনোকালে পানির ভীষণ এক প্লাবন হয়েছিলো, যা সে সমস্ত পর্বত শিখরকে নিমজ্জিত না করে ছাড়েনি।

এ সমস্ত অভিমত যাই হোকনা কেনো, এই অভিমতটিও অনুধাবনযোগ্য যে, সমগ্র মানবজাতি হজরত নূহ্ আ. এর বংশধর থেকে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কোরআন মজীদে ঐ সমস্ত বিবরণই বিবৃত হয়েছে যা উপদেশ ও নসীহতের জন্য প্রয়োজনীয়। অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়বস্তু এতে আলোচিত হয়নি।

কোরআন মজীদের বক্তব্য তো এটাই— ঘটে যাওয়া এই ঘটনা জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বরং স্মরণ রাখা উচিত যে, হাজার

হাজার বছর আগে একটি সম্প্রদায় আল্লাহ্পাকের নাফরমানী করে তাঁর প্রেরিত রসূল হজরত নূহ্ আ. এর হেদায়েত ও নসীহতের পয়গামকে অবিশ্বাস করেছে ও প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আল্লাহ্পাক স্বীয় অসীম কুদরতের নমুনা প্রকাশ করে সেই নাফরমান ও অবাধ্যদের তুফান ও জলোচ্ছ্বাস দ্বারা ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেই হজরত নূহ্ আ. ও তাঁর সহগামী ইমানদারগণকে সুরক্ষিত রেখে নাজাত দিয়েছেন।

উচ্চ মর্যাদাশালী পয়গম্বর হজরত নূহ্ আ. এর শানে আল্লাহ্পাক বলেন, 'নিশ্চয়ই নূহ্ আমাকে ডেকেছিলো এবং কতো উত্তমরূপে তাঁর জবাব দিয়েছিলাম এবং আমি সে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহা দুঃখ হতে উদ্ধার করেছিলাম। এবং আমি তার বংশধরকেই পৃথিবীতে অবশিষ্ট রেখেছি। আর তাঁর পরবর্তী লোকদের মধ্যে শুভ ইচ্ছা রেখে দেই যে, সমস্ত জগতে নূহের প্রতি শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি পুণ্যবানদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। সে আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্গত ছিলো।'

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

ISBN
984-70240-0042-0